শৈলেশ-নন্দিনী।

(নবন্যাস।)

—•—

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

—•—

প্রকাশক—

অক্ষয়কুমার দে এণ্ড সন্স।

"জগজ্জ্যোতি পুস্তকালয়।

১০৫ নং অপার চিৎপুররোড, কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ।

সন ১৩৩৩ সাল।

—•—

মূল্য ৸০ বার আনা।

৩৫৫৬

বিজ্ঞাপন।

নব উপন্যাসখানি ফুল্ল-কুসুম-সমা অতীব যত্ন-সহকারে গ্রন্থিত করিয়া আমার সৌহৃদ্য-বান্ধব, বাবু কমলকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণের কর-কমলে অর্পিত করিয়া চরিতার্থ হইলাম। গুণগ্রাহী পাঠকমণ্ডলীর আনন্দোৎপাদিত বীরাঙ্গনা শৈলেশ-নন্দিনীর বীরঙ্গতায় কারুণ্য-গুণে, বদান্যতা প্রভাবে, সতীত্ব জ্যোতিতে অন্তঃর্গত রঙ্গশালা রঞ্জিতময় হইয়া থাকে। কোমলাঙ্গী কমল-কুমারীর শাস্ত্রজ্ঞতায়, সৌজন্যতায়, পতি ভক্তি প্রখরতায় এবং সরলতা ও বিপন্নতাদি শ্রবণে পাঠক-বৃন্দকে ষড়রসে রসয়িত হইতে হইবে। পরী রাজকন্যা সোহিনার অদ্ভুত কীর্ত্তি-কৌশলাদি শ্রবণে প্রাচীন-প্রাচীনার ভক্তির উত্তেজন, যুবক-যুবতীর প্রণয় বিস্তৃত হইয়া থাকে। সানুকুল্যতায় আদ্যন্ত পাঠে পরীক্ষিত হইবেন। নিবেদন মিতি।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শৈলেশ-নন্দিনী।

(নবন্যাস।)

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:o:—

দুর্য্যোগ যামিনী।

দুর্দ্দিশ্চ বরিষা ধারাশ্রাবণ আকাশমণ্ডল নবঘনে আচ্ছন্ন, কখনও ফিন্‌ফিনে, কথনও টিপ্‌টিপে, কখনও মুষলধারায় বর্ষণ, ধারার বিরাম নাই। চপলার চিক্‌চিকানী, মেঘের ঘড়্‌ঘড়ানী, বজ্রের চড়্‌চড়ানীতে জগৎ সশঙ্কিত, ধরিত্রীদেবী নীলিমা মূর্ত্তিতে প্রাণীবর্গের হৃদ্‌পিণ্ড বিকম্পিত করিতেছে। বিপদের উপর বিপদ, দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেবও পশ্চিমাচলে বিশ্রাম লাভ করিলেন। রাত্র চারিদণ্ড অতীত হইল। অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার—ভীষণ

অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন করিল। আর কোলের মানুষটী পর্য্যন্তও দেখা যায় না। তার উপর মেঘের ঘর্ষণে বৃষ্টির বর্ষণে পবনের তাড়নে পৃথিবী মহাদুর্য্যোগময়। এই দুর্যোগে কাহারও সুযোগ কাহারও কুযোগ। উচ্ছ্বাসিত জলনিধি হিল্লোলে কল্লোলে মহা-তরঙ্গে রঙ্গ করিতেছে। দস্যুদল লম্ফে ঝম্ফে, মহাদম্ভের সহিত গৃহস্থের সর্ব্বনাশে শুভাগমন করিতেছে। ইঁহাদেরই সুযোগ, কুযোগ কেবল দুঃখিনী বিরহিনী পতি বিচ্ছেদ কাতরা সতীরমণী মদন তাড়নে তাপিনী হইয়া অজস্র ঝোরে উপাদান ভিজাইতেছে।

জেলা মুরশীদাবাদ সীমাবর্ত্তী বীরেশ্বর পুরনামক একটী পল্লী-গ্রামে একখানি জীর্ণ একতল ইষ্টকালয়ের কক্ষ মধ্যে মিট্‌মিটে প্রদীপ আলোকে এই সময় একটি অর্দ্ধবয়স্কা রমণী মৌনে নতবদনে উপবেশন করিয়া নয়নযুগলে বারি বরিষণ করিতেছেন। ইত্য-বসরে অকস্মাৎ একটী নব্যারমণী সম্মুখাগতা হইয়া বয়স্থার প্রতি বলিল মা তুমি কাঁদ্‌ছো। অপরিচিত ধন প্রাপ্তের ন্যায়, বা মুদিত কমল বিকাশিতের ন্যায়, উৎসাহে ফুল্লচিত্তে সহর্ষে বয়স্থা বলিল কমল, এই এলি বাছা, আমি তোর জন্যে পৃথিবী শূন্য-ময়, চক্ষে আঁধারময় দেখে হা কমল হা কমল করে এই বসে বসে কাঁদ্‌ছি। এই অন্ধকারে দুর্য্যোগে বীর পুরুষেও ঘরের বাহির হইতে পারে না, আর তুই সমর্থ মেয়ে হয়ে এই রাত্রি-কালে কোথায় গিয়ে কেমন করে নিশ্চিন্তে ছিলি কমল, হাঁ বাছা। এই কি তোর বুকের পাটা, গ্রামের লোকে আমাদের পদে পদে শত্রু, কোন রকম সূত্র পেলে আর কি ছেড়ে কথা কবে। এই রাত্রিকালে অন্ধকারে পথে ঘাটে দুষ্টলোক তোরে দেখ্‌তে পেলে কি হতো কমল। যেমন নয় তেমন নয়

ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে ছোট জাতের হাতে পড়ে জাতি খোওয়ায়ে কোন দিন আমার মাথা খেয়ে বস্‌বি, আর নির্ম্মল চাঁদের ন্যায় তেজস্বী যশস্বী এই রাজপুতবংশের হাসিমুখে কালি মাখিয়ে দিবি। বয়স্থা এই বলিয়াই নেত্রযুগলে আবার অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

নব্যা আগতা রমণীর নাম কমলকুমারী, বয়স্থার নাম তারাবতী। কমলকুমারী তারাবতীর একমাত্র কন্যা। তারাবতীর ভৎর্সিত কথাগুলি শুনিয়া কমলকুমারী পশ্চাৎ মুখী হইয়া একটু মৃদুহাস্য হাসিয়া তারাবতীর প্রতি বলিল হাঁগা, আমি কি এতই অবোধ যে আর কোথাও যাব, হেমচন্দ্রের কাছে পড়া টুকু করে নিতেই কেবল একটু দেরি হোলো। কমলকুমারীর কথায় তারাবতী যেন একটু রাগতা হইয়া বলিল, তোর পড়া নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব, মেয়েছেলের আবার পড়া কিসের, চাকরি কর্ত্তেও হবে না, আর ব্যবসা কর্ত্তেও হবে না, আর জমিদারী দেখ্‌তেও হবে না, মেয়ে ছেলের আবার লেখা পড়া কি। দেখ্‌ কমল! পড়া পড়া করে আর আমায় পোড়াস্‌নে আমি সব বুঝি তুই বাছা হেমচন্দ্রের প্রতি যে আশক্তা হয়েছিস্‌ তা আমি জানি। কথাটিও ভাল বই মন্দ নয় তাও জানি। ধনে মানে, কুলে শীলে ঘরটীও ভাল আর ছেলেটীও লেখায় পড়ায় সৎচরিত্রে সৎস্বভাবে সকল গুণে সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহ'লে কি হবে, আমাদের এতুরাদৃষ্টে তাতো ঘটবে না বাছা। ওযে অমৃতে গরল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমলে কণ্টক, সমুদ্রে লবণ।

তারাবতীর হতাশবাক্যে কমলকুমারীর মুখ কমলখানি বিবর্ণ, স্বর্ণকান্তি মলিনা কপোলদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মদর্শন হইল, সোণার

প্রতিমাখানি অকস্মাৎ জড়শর হইয়া নতমুখে উভয় কর-পল্লবের নখের নখ ঘর্ষণ করিতে করিতে মৃদুস্বরে বলিল, মা আমি তোমার ঐ কথাগুলির কিছুই কারণ বুঝিতে পারিলাম না, হেমচন্দ্র এই কথাটি অর্দ্ধ স্ফুট করিয়া কমলকুমারী সাবধান হইল, আর কিছু বলিল না।

তারাবতী কমলকুমারীর প্রতি বলিলেন, ক্ষেপামেয়ে এও আর বুঝিস্‌নে, নবকুমার বাবুইতো ছল চাতুরী করে, মিছে মামলা খাটিয়ে তাঁকে কারাবাসে দিয়ে অত ধন দৌলত জমিদারী করেছে। এখন আমি যদি তাঁর ছেলের সনে তোর বে দেই, তাহ'লে তিনি ভগবান কৃপায় মুক্তি হয়ে এসে রাগ করতে পারে-নতো। তাই যেন না করুন, কেননা তিনিই আমায় উপদেশ দিতেন, যে বলবন্ত শত্রুকে যেন তেন প্রকারে বশীভূত করিবে। বিশেষ এ গ্রামে বসবাস করে নবকুমারবাবুর সহিত অসৎভাব রাখা আর হিংস্রক জন্তু পূর্ণিত দুর্গমবনে রাত্রিযাপনা করা এ উভয় কথা সমান। কারণ আজকাল নবকুমারবাবুর অতুল সম্পত্তি অদ্ভুত প্রতাপ, ভয়ঙ্কর শাসন, বিশেষতঃ আমাদের প্রতি বিষ-দৃষ্টি। তিনি যদিও আমার অন্তচ্ছেদ করেন, বিনাদোষে যদিও আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেছেন, তথাচ লোকাচারে কাহারও নিকট তাঁর প্রতি আমি অসৎভাব জানাই নাই, কাহারও নিকট ভাল বই মন্দ বলি নাই। কিন্তু তাঁর সেই ষড়-যন্ত্ররূপ ছুরিকাঘাতে আমি যেরূপ অসহ্য যাতনাভাগী রহিয়াছি তাহা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন। এই বলিতে বলিতে তারাবতীর নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। তারা-বতী দক্ষিণ করে কমলকুমারীর গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া বলিলেন,

কমলরে! ইহাতেও যদি বাছা হেমচন্দ্রের কমল করে তোরে সমর্পণ কর্‌তে পারি তাহলেও এ জীবন সার্থকময় হয়, আমার বিচলিত চিত্ত সুশীতল হয়। নবকুমারবাবু আজকাল যেমন ইন্দ্র তুল্য সুখভোগী, তেম্নি রূপবান, গুণবান বিদ্বান, পুত্র হেমচন্দ্রও সোনার গাছে হীরারফুল ফোটার মত পিতা মাতার হৃদাকাশ আলোকিত কচ্ছে! আমার সুমতী, সুশীলা, সুকুমারী সৌন্দর্য্যময়ী কমলকুমারীর সহিত বৎস হেমচন্দ্রের পরিণয় সম্পাদনে যে রোহিণী চন্দ্রের মত সুমিলন হইবে, এবং উভয় পিতামাতার নয়ন জুড়াইবে ইহা নিশ্চয়। কিন্তু এ কল্পনা, আর বাসনা কেবল আমার ভ্রমমাত্র। দরিদ্র ব্যক্তি স্বপ্নে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নিদ্রাভঙ্গে যেমন হতাশ হইয়া থাকে, তেম্নি আমারও এ আশা কেবল দুরাশামাত্র। সমুদ্রে সমুদ্র ভিন্ন সামান্য কূপোখণ্ডের সহিত সন্মিলিত হয় না। পরিণয়সূত্রে তারাবতীর মুখে নৈরাশ্য শ্রবণে কমলকুমারী শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় চঞ্চলিতা হইল। দিবাকর অস্তে কমলিনীর ন্যায় মুদিতা বা মলিনতা হইল, কমলকুমারী আকাশ পাতাল কত কি ভাবিয়া পরিশেষে মনে মনে কল্পনা করিল, কাল হেমচন্দ্রকে এই সকল কথা বলিব, দেখি হেমচন্দ্রই কি বলে। হেমচন্দ্র কি এতই নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, নির্ম্মম হইবে, তা কখনই পারিবে না। হেমচন্দ্রকে জীবন সহিত এদেহ সমর্পণ করছি। হেমচন্দ্রকে আমি পতিত্বপদে অভিসিক্ত করিয়া হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছি। এ জগতে যাবতীয় পার্থিকতা, স্বার্থকতা এবং ভালবাসাদি সুখ সৌজন্যতা, এ সকলিই আমার হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্রই এ দেহের জীবন স্বরূপ, আমি পুতলীকামাত্র। যপ, তপ, সমাধি বিধি আদি গৃহশ্রমীর যাহা

কিছু নৈতিক কার্য্য, তাহা সকলিই আমার হেমচন্দ্র। পশ্চিম দিগ্বিভাগে যদি সূর্য্যের উদয় হয় সুমেরুর যদি গতি শক্তি হয়, অগ্নিতে শীতলত্য, আর পর্ব্বত শিখায় পদ্ম বিকশিত হইলেও হেমচন্দ্র হতে আমি হতাশা হব না। কারণ হেমচন্দ্র অসামান্য বিদ্যাভ্যাসী। ব্যাকরণ জ্যোতিষ ছন্দ, ঋগ্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এই চারিবেদ, এবং মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ, অর্থশাস্ত্র আদি হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্থ, হিংসা, অসত্য, কপট, মিথ্যা আদি হেমচন্দ্রের নিকট স্থান পায় না। মহাজ্ঞানী, মহাত্মন হেমচন্দ্র তার আশ্রয় লতিকা কমলে বিচ্ছিন্ন করে অন্য রমণীর পাণিগ্রহণ করিবেন একথা মনে করিলেও মহাপাপের আশ্রয় হয়। তথাচও পোড়া মন আর বোঝেনা, বৃথা চিন্তায় অস্থির হচ্ছি।

দেখিতে দেখিতে রাত্র দুই প্রহর অতীত হইল। মেঘমালা পরিষ্কৃত হইয়া আকাশ মণ্ডল নির্ম্মল হইল। আর ঝটিকাও নাই আর বৃষ্টিও নাই। আকাশ মাঝে তারাঘেরা চাঁদখানি উজ্জ্বলিত হইয়া পৃথিবী আলোকিত করিলেন। তারাবতী কমলকুমারীকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলে কমলকুমারী বলিল না মা। আমি আর কিছুই খাইব না, আমার মাথা ধরিয়াছে। তারাবতী কাতরা হইয়া বলিলেন, না মা। আমার মাথার দিব্য, যাহা হয় কিছু না খাইলে আবার অসুখ হইবে। কমলকুমারী কিছুতেই কিছু শুনিল না, কিছুতেই কিছু খাইল না, কোমল অঙ্গখানি কোমল শয্যায় মিলিত করিয়া কমল আঁখি দুটী মুদিত করিল। তারাবতীরও অগত্যা তাহাই ঘটিল। উভয়েই শায়িত উভয়েই নিদ্রিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন

পাঠক, এ পর্য্যন্ত কমলকুমারীর লাবণ্যের বা বয়সের পরিচয় পান নাই। কমলকুমারীর বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ, রংখানি ফুটন্ত গোলাপ ফুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অঙ্গখানি দীর্ঘও নয়, খর্ব্বও নয়, সুদৃষ্টা মধ্যমা। কমলকুমারী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। সুগোল কপোল, সুগোল গণ্ডযুগলের মধ্যভাগে ঈষদ রুধিরাক্তময় সুদৃশ্য। সুগোল, গ্রীবা, এবং সুগোল ওষ্ঠাধর ছুটিও টুকটুকে, তন্মধ্য ভাগ হইতে অত্যাশ্চর্য্য ফিকফিকে হাস্য দর্শন। অথচ প্রকৃত হাসিও নয়, কেবল রূপের স্বভাব লক্ষণ। কমল-কুমারীর চক্ষুদুটি অতিশান্ত, অতি প্রশস্ত, অতি সুঠাম, অতি শান্ত জ্যোতিঃ। কমলকুমারীর চিত্তবৃত্তিও যেরূপ সরলতা, হরিণী নিন্দিত চক্ষু দুটিও তদ্রূপ সরলতা! অর্থাৎ দৃষ্টির কুটিলতা থাকিত না। যদি কেহ কখন সেই দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি করিত, অমনিই পল্লব দু'খানি পড়িয়া যাইয়া কেবল মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য দৃষ্ট হইত না। কমলকুমারী কুঞ্চিত, লম্বিত,

কেশরাশী সাপিনীর ন্যায়, কপোলে, গণ্ডে, উরশে, অংশে ছড়াইয়া রূপের উপর আবার একটী অপরূপ দর্শন হইতেছে। পশ্চাৎগামী কেশ গুচ্ছ জঙ্ঘার নিম্নদেশে পতিত হইয়া নিবিড় মেঘখণ্ডের ন্যায় শোভান্বিত হইয়াছে। রূপ গর্ব্বিতা রূপময়ী কমলকুমারীর বাহুতে, উরুতে, অংশে, কণ্ঠে, কোমলাঙ্গীর অঙ্গে অলঙ্কারে চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল প্রকোষ্টদ্বয়ে রত্নময় বলয় যুগল মাত্র। বিনা অলঙ্কারে যার রূপের ছটায়, রূপের ঘটায় গৃহ আলোকিত করেছে তার আবার অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? সোণার গাছে ফুলের মালা কেবল হাস্যস্পদ মাত্র। কমল-কুমারীর যে কেবল সিমুল ফুলটির মত রূপরাশী মাত্র তাহাও নয়, ইনি মহাজ্ঞানা, গুণশীলা রমণী। সখ্য, শান্ত, কারুণ্য, ভক্তি, মাধুর্য্য এই ষড়রস বিভক্তা। কমলকুমারী স্থিরা, ধীরা, মন্থর গমনা, সুহাসিনী, সুভাসিনী, নম্রস্বভাবা যুক্ত একটী অসামান্যা গণ্যারমণী। তারাবতীর বয়ক্রম ত্রিংশ বর্ষ, রংখানি দুধে আলতায় দেহখানি কিঞ্চিৎ স্থূল, অথচ স্বাভাবিক। বয়সী তারাবতী ছেলে পুলের মা, তথাচও মুখখানি বেশ ঢলঢলে হাসি মাখান, গাত্রে অলঙ্কারাদি শূন্য, কেবল সধবাচিহ্ন লৌহ খাড়ুমাত্র। তারাবতীর মুখখানি ঢলঢলে হাসি মাখান হইয়াও যেন শরৎচাঁদে মেঘের আপসা পড়িয়াছে। মুখখানি মলীনা, বর্ণ বিবর্ণা হইয়াছে। তারাবতী সর্ব্বদাই শোকাতুরা, সর্ব্বদাই হাহুতাশে, মর্ম্মপীড়নায় দিনযাপনা করিতেছেন।

কমলকুমারীর পিতার নাম জয়ধর সিংহ। বীরেশ্বর পুর-গ্রামে সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য নবকুমারবাবুর বাস। ইংরাজ রাজ্যের ভারতবর্ষ অধিকারকালে নবকুমারবাবু, এবং জয়ধর সিংহ,

উভয়েই কর্ম্মচারী ছিলেন। কোন কারণবশতঃ উভয়ে বাদানুবাদ হওয়ায় নকুমারবাবু জয়ধর সিংহের উপর ক্রোধবশতঃ একটি মিথ্যা অভিযোগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর জন্য কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত করেন। সেই সময় কমলকুমারীর বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র। কমলকুমারী জয়ধর সিংহের একমাত্র কন্যা। জয়ধর সিংহের বিনাদোষে কারাদণ্ডের জন্য দেশস্থ সকলেরই মনক্ষুণ্ণ হইল, নবকুমারবাবুর পীড়ন ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারিল না। কয়েক বৎসর গত হইলে, নবকুমারবাবুর পুত্র হেমচন্দ্র জ্ঞানবান্ হইলে পিতার অন্যায় ব্যবহারে অত্যান্তিক মর্ম্মপীড়া পাইলেন। তদকালাবধি জয়ধর সিংহের পত্নী তারাবতীর পতি এবং বালিকা কমলকুমারীর প্রতি অত্যান্তিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। পিতার অজ্ঞাতে উহাদের নানারূপ সাহার্য্যও করিতেন। কমলকুমারীকে আপন পাঠকগৃহের নিকটে বসাইয়া অতীব যত্নের সহিত নানারূপ বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। ক্রম সম্বন্ধে উভয়ে উভয়ের প্রতি ভালবাসা, একপ্রাণ এক জীবন হইল। উভয় অঙ্গ একাত্মার ন্যায় প্রথম সঞ্চারিত হইল। এমন কি, ক্ষণেক অদর্শনে উভয়েই চঞ্চলিত বা উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। ক্রমান্বয়ে প্রণয় সাগর উত্থিত তরঙ্গরঙ্গ হিল্লোলে মাতঙ্গ মাতিয়া উঠিল। কমলকুমারী এখন বয়স্থা, প্রখর মতী, হেমচন্দ্রের প্রতি আর তত্টা মুখরা নাই। হেমচন্দ্রের সহিত কথা কহিতে এক প্রকার লজ্জায় নত বদনা, চোখাচোখি হইলে কখনও চক্ষের পল্লব পড়িয়া অধোদৃষ্টা। যৌবন প্রারম্ভে স্বামী সম্মুখে নবযুবতীর চালচলন বা করণ কারণগুলি কি মনোহর, কি সুন্দর, কি সুদৃশ্য, ইহা যুবক মাত্রেই পরিজ্ঞাত।

কমলকুমারীর অঙ্গভঙ্গত ভাবভঙ্গী, এবং অতুলনীয় রূপরাশী দর্শনে, সুধাসম সুমধুর সুস্বর শ্রবণে, মনে মনে ভাবিলেন এই সোণার প্রতিমা রমণী রত্নটীকে আমার ভাগ্যে সংঘটিত হইবে। কিন্তু আমার প্রাণেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী, কমলকুমারীতে বৈমুখ হইলে, এ অসার জীবনেতে প্রয়োজন নাই। সুবাসিত চন্দনাশ্রয়ে বঞ্চিত হইয়া নিম্নতলে অবস্থান করিব। না অমৃতাধার বর্জ্জিত করিয়া বিষপানে সুস্থতা হইব। যদি দারপরিগ্রহ করিতে হয়, যদি এজগতে জীবনধারণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তবে প্রাণময়ী কমলকুমারী ভিন্ন সকলেই বিষদৃশ্য।

হেমচন্দ্রের বয়স দ্বাবিংশতি বৎসরের কিয়ৎপরিমাণে অধিক হইবে। নবকুমারবাবু হেমচন্দ্রের বিবাহের কথা বারেবারে উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু কমলকুমারীর সহিত নয় অন্যান্য পাত্রীর সহিত, তাহাতে হেমচন্দ্র বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্নতার ভাণ করিয়া এখন নয় তখন বলিয়া সময়াতিবাহিত করিতেছেন। এইবার হেমচন্দ্র ও কমলকুমারী, এই উভয়ে যে পরিণয় ইচ্ছুকতা ইহা গ্রামে সকলের নিকটেই প্রায় প্রচার হইয়াছে। অনেকেই কাণাকাণি দ্বারায় ঐ বিষয় আন্দোলন করিতেছে। তারাবতী নবকুমারবাবুর পত্নী চাঁপাবতীর নিকট বিনয়সহকারে গোপনে একটী ঘট্‌কী পাঠাইয়াছেন। চাঁপাবতীর বয়স প্রায় ত্রিংশত বৎসর, রংখানি হলুদমাখান, দৈর্ঘে অধিক দীর্ঘাও নন এবং খর্ব্বাও নন, কথঞ্চিত স্থূলাকার জন্য আহ্লাদী পুতলীকাটীর মত। যেমন ঘম্‌কাল সংসার, তেম্নি ঘম্‌কাল মানান সই গৃহণীটী হইয়াছেন। তারাবতী প্রেরিতা ঘট্‌কীকে আশ্বাসিতবাক্যে বিদায় দিয়া

চাঁপাবতী নবকুমারবাবুর নিকট গমন করিলে নবকুমারবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন এস। না খাওয়া না দাওয়া, আহারের সময় আবার কি মনে করে? চাঁপাবতী ভ্রূভঙ্গিতে বলিলেন আমার আহারের জন্য আর তোমার ভেবে কষ্ট পেতে হবে না। তুমি তোমার বিষয় নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাক, অন্য ব্যবস্থার আর দরকার নাই। নবকুমারবাবু বিস্ময় সহকারে বলিলেন ও আবার কি কথা, কেন কোন বিষয় কি অব্যবস্থা কর্‌ছি, আর কোন বিষয়েই বা তত্ত্বাবধান রাখিনে, উৎকণ্ঠা সময় গায়ে পড়ে ঝগড়া কর্ত্তে এলে যে দেখ্‌ছি। চাঁপাবতী বলিলেন, গায়ে পড়েই ত ঝগড়া কর্ত্তে এসেছি। কিন্তু যে কথার জন্য এসেছি তার একটা হেস্তা নেস্তা কর্‌বো, নয় আজ আত্মঘাতী হব। গৃহিণীর ক্রোধ হইলে সংসার অসার ভাবিয়া নবকুমার-বাবু ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, বলি তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসনা, রাগ করা কেন, কি হয়েছে, না কি কর্ত্তে হবে তাই ভাল করে বলনা কেন। চাঁপাবতী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, আমি ভাল করে বল্‌তে জানিনে, যে ভাল করে পারে, তুমি তার সনে কথা কইয়ো, বলি আমার হেমচন্দ্র কি আইবড় থাকিবে তুমি ত আপনার বিষয় কাজেই ব্যস্ত, আমি যে খেতে শুতে ঐ ভাবনাতে অস্থির হচ্ছি তাতো দেখ্‌ছনা। নবকুমারবাবু বিস্ময়রাশিতে বলিলেন তুমি কি ঘুমের ঘোরে কথা কচ্ছ। আমি যে কত দফায় হেমচন্দ্রের বিবাহের কথা উত্থাপন করেছি কয়েকবার ঘটকের দ্বারায় পাত্রীর স্থিরতা করেছি, তাতে করে কয়েকবারই হেমচন্দ্র অমত করেছে। এখন বিবাহ করিলে আমার বিদ্যাভ্যাসের অসুবিধা হইবে, এই কথা পরম্পরায় আমার

কর্ণগোচর করাইয়াছে। সে বিষয় তুমিত সকলিই জান, তবে আজ আবার অকস্মাৎ আমার উপর দোষারোপ কেন, তাত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। চাঁপাবতী বলিলেন তা আমি জানি, কিন্তু দুধের আস্বাদ কি ঘোলে মিটে, না আমড়া গাছে আম ফলে থাকে। হেমচন্দ্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছা কমলকুমারীকে বিবাহ করিবে, ঐ জন্যইত অন্যান্য মেয়ের কথায় ছেলে আমার বিবাহে অমত করে, এত আর কি বুঝতে পার না। নবকুমারবাবু বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, কমলকুমারী কে? চাঁপাবতী বলিলেন কমলকুমারী কে তাও বুঝি আর জান না। কমলকুমারী জয়ধর সিংহের কন্যা। যাহার সহিত তোমার একাত্মা এক জীব সম প্রণয় ছিল। আমাদের বাদানুবাদে যাহার কারাদণ্ড হইয়াছে।

নবকুমারবাবুর চক্ষুদ্বয় রক্তিমাকার হইল, মহারণেঃ শার্দ্দূল সমাগমে সিংহের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জনের সহিত বলিলেন, হেমচন্দ্রের এরূপ দুর্গতি ঘটিল কেন। সিংহের শাবক হয়ে শৃগালেতে মনন। স্বর্গীয় দেবতার নরলোকে গমন, সত্যই কি স্পৃহনীয় কি দুরাভিসন্ধি। ঐরূপ কু প্রবৃত্ততার জন্যই কি আমি হেমচন্দ্রকে ষড়শাস্ত্রে নৈপুণ্যতা করিলাম আমার অতি যত্নের হীরকখানিতে সম্বুকোৎপন্ন হইল। চাঁপাবতীর প্রতি বলিলেন, গৃহিণী, ঐ ঘৃণিত কল্পনায় তুমিই বা কেমন করিয়া ইচ্ছুক হইলে চাঁপাবতী বলিলেন, তুমি যাহা বোঝ তাহাই ভাল, যাহা বল তাহাই ভাল, যাহা কর তাহাই ভাল, আমরা যাহা করি তাহা সকলিই মন্দ কন, সোজাকথা বলতেই বা দোষটা কি। কেন, জয়ধর সিংহ কি আমাদের হইতে হীন বংশ, না দুষিত না কলঙ্কিত।

নবকুমারবাবু বলিলেন, দূষিত আর কাহাকে বলা যায়, কারাবাসী যবনোস্পর্শিয় অন্নাহারীর আবার জাতি কি। চাঁপাবতী বলিলেন, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে যদি জাতি ভ্রষ্ট হইত, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুয়ানি, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব কিছুই থাকিত না। তথাচ বিনাদোষে, কেবল তোমার ক্রোধ বশতঃই সে ব্যক্তি দণ্ডিত হইয়াছে। নবকুমারবাবু ক্রোধে, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, দেখ গৃহিণী, তুমি যতই বল, যতই চেষ্টিত হও, আমার জীবনসত্ত্বে ওরূপ ঘৃণিত কার্য্যে কিছুতেই সম্মত হইব না। অমরাবতীতে বিষবৃক্ষ রোপণ ক'রে পরিশেষে ইন্দ্রতুল্য সংসারটী কি ছারে খারে দিব, না স্ত্রীর বুদ্ধিতে আমার হেমচন্দ্রের গলে মণিমাল্য জ্ঞানে ফণিমাল্য পরাইব, কিছুতেই না, জয়ধর সিংহের দুহিতা আমার পুত্রবধূ হবে, একথা মনেও স্থান দিয়োনা। চাঁপাবতী বলিলেন, আমি বুঝেছি তোমার ঐ সকল কথাগুলি কেবল ক্রোধ বশতঃ। মনুষ্যের ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়, ক্রোধে হিতাহিত রহিত হইয়া পরিশেষে বিপরিত দাঁড়ায়। যাই হোক, আপনাকে এ পর্য্যন্ত তুমি বাক্যে সম্বোধনে অপরাধী হইয়াছি, ঐ জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনি স্বামী, আমি আপনার পত্নী, দেবসম স্বামী বাক্য প্রতিপালন, স্বামীসেবা, স্বামী পরিতুষ্টই রমণী জাতির প্রধান ব্রত, মন্ত্রদাতা ইষ্টদেব অধিক আপনি আমার পুজনীয়। যাগ, যজ্ঞ, যপ, তপ. দেবার্চ্চনাদি আপনিই আমার সর্ব্বস্ব। আপনিই আমার ত্রাণ কর্ত্তা পরম গুরু। আপনার সহিত বাচালতা বা বাক্যের বিরুদ্ধতায়, চরমে কেবল আমার পরমপথের বিঘ্নতার কারণ। তথাচ আর কিছু না বলিলেও আমার মনের চাঞ্চলতা নিবারণ হচ্ছে না। কেননা আপনিই

আমাকে বলিয়াছিলেন, যে কার্য্যানুক্রমে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ, সকলের পরামর্শ শুনিতে হয়!

নবকুমারবাবু বলিলেন, তোমার যাহা বলিবার ইচ্ছা অবশ্যই বলিতে পার, তাহাতে আমার কোনই বাধকতা নাই। চাঁপাবতী বলিলেন, প্রকৃত পক্ষে জয়ধর সিংহের বংশটী নির্দ্দূষিত, নিষ্কলঙ্কীত, দীপ্তমান উজ্জ্বলিত বংশ। এবং ফুল্ল কমল সদৃশ তাঁর কন্যারত্ন কমলকুমারীটি, রূপে রতী-দেবী, গুণে সাবিত্রী, কারুণ্যে লক্ষ্মী, বিদ্যা বুদ্ধিতে সরস্বতী, এবং লক্ষণেও পরম সৌভাগ্যবতী। যদি অধিনীর কথা অবহেলা না করেন, তবে নিশ্চিত পক্ষে বলিতে পারি, কমলাসমা কমলকুমারীর পুত্রবধূরূপে অধিষ্ঠিতা হইলে, এ গৃহটী সকলরূপে মঙ্গলময়, এবং জ্যোতির্ম্ময় হইবে। এবং হেমচন্দ্রও কমলকুমারীতে নব-প্রণয়-লতিকা অদূরিত হইয়াছে, উহাতে সযতনে পরিণয়-বারি সিঞ্চন করিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ এই ত্রিগুণান্বিত ফল ফলিত হইবে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আপনার মাৎসর্য্য আসিতে উহা ছিন্ন হইলে একটা বিপর্য্যয় অমঙ্গল অসম্ভব।

চাঁপাবতীর ঈদৃশবাক্যে নবকুমারবাবু কর্ণপাতমাত্রও না করিয়া হেমচন্দ্রের বিবাহের জন্য পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ করিতে করিতে বীরেশ্বর পুর সন্নিদ্ধ মহলা নামক গ্রামে একটি পাত্রী স্থির হইল। উভয় পক্ষেই কন্যা ও পাত্র নিরক্ষণ করা হইল। পানপত্র হইল, বিবাহের দিন স্থির হইল। হেমচন্দ্রের মহাধুমধামের সহিত বিবাহ হইবে, নবকুমারবাবু ক্রম সম্বন্ধে তাহারই আয়োজন করিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে

বাইওয়ালী, থ্যাম্‌টাওয়ালী, ইংরাজি বাদ্যকর, এই সমস্ত বায়না করা হইল। নিজ গ্রামে খাদ্য দ্রব্যাদিরও বায়না হইল। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণ, ভট্টাচার্য্য, স্বজাতী কুটুম্বাদির নিমন্ত্রণ হইল।

নবকুমারবাবুর বাটীতে মহাহুলস্থুল ব্যাপার, আজ হেমচন্দ্রের বিবাহ। নৃত্যকী, গাহকী, বাদ্যকর, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, কুটুম্বাদির সমাগমে বাটি পরিপূর্ণ। সরকারী কর্ম্মচারীদের হুড়াহুড়ী, দৌড়াদৌড়িতে, দাসীদিগের হাঁকাহাঁকিতে, হাট বসিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যাদেবীর সমাগমে, দীপ্তমান আলোকরাশীতে, দিবাভাগ সমপুরীখানি আলোকিত হইল। নবকুমারবাবুর বাটীর উত্তর সীমায় ভাগীরথী নদীতীরস্থ একটি উপবন। ঐ উপবনে, রাত্রি চারিদণ্ড সময়, একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া কমলকুমারী কমল-নয়ন-যুগলে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ কপোলে, গণ্ডে, বক্ষে বিস্তারিত। কমলকুমারী ছিন্ন বেশা, মলীনা, জীর্ণ বসনা, এলোথেলো পাগলিনীর ন্যায়, এক একবার ভাগীরথীর জল রাশিতে কটাক্ষ করিতেছে, আবার নতবদনে নয়নজলে বক্ষ ভিজাইতেছে। আজ পূর্ণিমা রজনী, চন্দ্রিমার চটকে মলীনা কমলকুমারীর রূপের চটকে বনস্থল আলোকিতময়। প্রকৃতির কি বিচিত্র ময় গতি, কাহাকেও আনন্দে ভাসাচ্ছেন, কাহাকেও নিরানন্দে কাঁদাচ্ছেন। ভাগীরথী গর্ভে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব বিরাজিত, সুধাংশুকে ক্রোড়ে পাইয়া, জলময়ী হিল্লোলে এবং তরঙ্গছলে আনন্দ নৃত্য করিতেছেন। এদিকে সোণার প্রতিমা কমলকুমারীর ক্রন্দন দর্শনে বন্য পশু পক্ষী সহিত বনদেবী ব্যাকুলিতা হইলেন।

নিশ্চল, নিরাহারী, ইন্দ্রিয় সংযমিত তাপসীর ন্যায়, জ্যোতির্ম্ময়ী কমলকুমারী এইবার সংজ্ঞাহীনা। চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীনা কমলকুমারীর দুরাবস্থা দৃষ্টে, মৃগমৃগী দলে স্থির নেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যেন কতই কি ভাবিতেছে। এই সময় হেমচন্দ্র কমল-কুমারীর সম্মুখাগত হইয়া ব্যস্ততার সহিত বলিল, কমলকুমারী, তুমি এখানে বসিয়া কাঁদিতেছ। আমি তোমার সমস্ত গ্রাম, সমস্ত পল্লী অন্বেষণ পূর্ব্বক নিরাশায় ক্লান্তচিত্তে এইখানে আসিয়া তোমায় দেখিতে পাইলাম। কমল, তুমি এখানে কেন। কমলকুমারীর নয়ন দুটি এইবার বেগে বর্ষণ হইতে লাগিল। পুনশ্চ সম্বিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে নয়নবারি মোচন করিয়া, মৃদু স্বরে বলিল, হেমচন্দ্র, আজ তোমার শুভ বিবাহ, এ সময় তুমি কেন এখানে আসিলে। হেমচন্দ্র বলিল আবার করবার বিবাহ করিব। আমি যে আমার কমলের কমলাঙ্গে নির্ম্মল মনমালা সমর্পণ করিয়াছি, একদেহ, একপ্রাণ, একমন, কয়জনাকে দিব। এই রাত্রিকালে হিংস্রকময় বন্য ভূমিতে আসিয়া কাঁদিতেছ কেন কমল, তোমার কি প্রাণের আশঙ্কা নাই কমল। কমল বলিল আমার প্রাণ যদি আমাতে থাকিত তাহা হইলে আশঙ্কা হইত। পরাধীনা প্রাণ যাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছি, তিনি সুখে থাকুন, বিবাহ করুন, সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই। তোমায় বলিতে কি হেমচন্দ্র, তুমি সুখী হইলে আমি মরিয়াও সুখী হইব। হেমচন্দ্র বলিল এ প্রাণ যাহার অনুগত তাহাকে ছাড়িয়া কাহার সহিত সুখী হইব। বিনামেঘে শূন্যাকাশে কি বারি বর্ষণ হইয়া থাকে কমল। আমি যদি অন্যের সহিত বিবাহ করিব, তবে মন্ত্র

পীড়ায় পীড়িত হইয়া সুস্থতা জন্য তোমার নিকট আসিলাম কেন কমল? এ প্রাণ যে কমলাগত, তাও কি জান না কমল। কমল, জীবন সংসয়াম্বিত বিজনারণ্যে রজনীযোগে কি জন্য আসিয়াছ ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া আমার মর্ম্মান্তিক নিবারণ কর।

কমল কুমারীর চক্ষে আবার টশ্ টশ্ করিয়া জল পড়িল। শৈলেশ-নন্দিনী যদি আসেন, ভাগ্যক্রমে তাঁর যদি দর্শন পাই, তবে তাঁকে আপনার বিবাহের শুভ সংবাদটি দিয়া বিদায় হইব, এইজন্যই এখানে আসিয়া ছিলাম। এই বলিয়া, বস্ত্রা-ঞ্চলে চক্ষু পরিষ্কৃত করিয়া, কমলকুমারী বলিল, হেমচন্দ্র, শৈলেশ-নন্দিনী দেবী না মানবী, তাহা কি তুমি বলিতে পার? হেমচন্দ্র বলিল তিনি দেবী না মানবী বটেন, কিন্তু দেবী সমই তিনি স্বক্ষমাপন্না। শৈলেশ-নন্দিনী যোগসিদ্ধা, মহা-তেজস্বিনী, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারায় নিজ ইন্দ্রিয়কে পরাভূত করিয়া-ছেন। তিনি যাহা বলেন তাহাই হইয়া থাকে, যাহা বলেন তাহাই নিশ্চিত. তাহাকে সকলে বাক্‌সিদ্ধা মানবরূপী দেবী বলিয়া থাকেন। তিনি যাহার প্রতি শুভদৃষ্টি করেন তাঁহার সর্ব্বত্রই মঙ্গলজনক হয়, এবং ক্রোধদৃষ্টে দুর্জ্জন জনাকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকেন। কমলকুমারী বলিল তিনি যে এক্কদিন বলিয়াছিলেন, হেমচন্দ্রে, কমলকুমারীতে বিবাহ দিব। তবে কই আজ একবার দর্শন দিলেন নাই কেন। হেমচন্দ্র বলিল তাঁর ইচ্ছা তিনিই জানেন, তিনি যাহা বোঝেন তাহাই সত্য, কিন্তু বিবাহ পক্ষে যাহা স্থিরতা করিয়াছেন, তাহা অব-শ্যই সংঘটিত হইবে, সেই অসদৃশ মুখের বাক্য বেদসম অটল

কমলকুমারী বলিল, না হেমচন্দ্র তাহা আর এ জন্মে হইয়া কাজ নাই, পতিস্থানে যদি ও চরণে মনগতি ভক্তি করিয়া থাকি, আর দেবী শৈলেশ-নন্দিনীতেও যদি দেবীতুল্য ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা রাখিয়া থাকি, তবে পুনর্জ্জন্মে ও চরণে সেবিকা হইয়া, পতিসেবা রূপ মহাব্রতে ব্রতী হইয়া, এ জীবনে সার্থকতা হইয়া, হেমচন্দ্র বলিল কমল, তুমি বারম্বার দুঃসহ কথা বলিয়া আর আমায় মনাগুণে দগ্ধিভূত করিও না। পুনর্জ্জন্মে তুমি আমার পত্নী হইয়া সংসার আশ্রম গ্রহণ করিবে, আর এ জনমে কমল-কুমারীর পরিবর্ত্তে অন্য রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া কমল বিচ্ছেদে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিব। শোক সাগরে ভাসিতে থাকিব, মনাগুণে পুড়িয়া মরিব, কিম্বা অসহ্য যাতনায় বিষ পানেই জীবন হারাইব, ইহাই কি তোমার ভাল হইবে কমল।

কমলকুমারী আবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ছি ছি হেম-চন্দ্র, ও কথা কি বলিতে আছে। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সকল গুণে গুণবান হইয়া আমাসম সামান্য রমণীর জন্য চিন্তান্বিত হইবে। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিছুরই অভাবনীয় নাই। ভাল ভাল ঘর হইতে ভাল ভাল সুন্দরী আনিয়া তোমার বিবাহ দিবে। রূপবতী রমণী লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিবে। আমি ঘৃণিতা, দূষিতা, কুৎসিতা, দুঃখিনীর কন্যা। আমাকে বিবাহ করিলে পিতার নিকট নিন্দিত হইবে, পরস্পরের অপবাদ করিবে, তাহা বিপরিত দাঁড়াইয়া সুখ-সরোবরে গরলোত্থিত হইবে। তুমি পিতার নিকট বিষদৃষ্ট হইলে, বিষধর দংশনের ন্যায় আমার অসহ্য যাতনা হইয়া সোণার সংসার ছারখার হইয়া

যাইবে। তাই বলি হেমচন্দ্র, এ জনমের জন্য কমল নামে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহে যাও, রাত্রি হইয়া যাইতেছে, এতক্ষণ সকলে বোধ হয় তোমায় খুঁজিতেছে, আজ তোমার বিবাহ, এই বলিয়া কমলকুমারী চক্ষু মুছিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র বিস্ময়ান্বিতে বলিল কমল, আমি বিবাহ করিতে গৃহে যাইব, আর তুমি নিশাকালে বিজনারণ্যে একাকিনী বসিয়া থাকিবে। তুমি নিতান্ত পাষাণী, নির্দ্দয়া, নির্ম্মমতা, তাই একথা বলিলে। এরূপ নিষ্ঠুরতা বাক্য নিঃসৃত করিতে বিন্দুমাত্রও তোমার মমতা জন্মিল না কমল। আমি এ জনমে আর অন্যকে বিবাহও করিব না, এবং পাপময় গৃহেও আর যাইব না। পিতা আমার তোমার পিতাকে বিনাদোষে মিথ্যা অভিযোগে কারাবাসে দিয়াছেন, এবং প্রজা সকলকেও নিষ্পীড়িত করিয়া কষ্টভোগী করিতেছেন। ইহাতেও আমার প্রাণের প্রাণ প্রিয়তমা কমলকুমারীকে আমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেও সংসারী হইয়া, পিতার দুর্ব্বৃত্ততা নিবৃত্ত করিতাম। পিতা আমাকে সে বাসনা হইতে নিরাশা করিলেন। আমি কমলকুমারী শূন্য গৃহে আর যাইবও না, বীরেশ্বর পুরবাসীদিগের এ মুখ দেখাইব না। কমল, চল তোমাকে লইয়া দেশে দেশে, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, ভ্রমণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। কমলকুমারী বলিল না হেমচন্দ্র, তাহা কি করিতে আছে, আজ তোমার বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, বিবাহ না করিয়া জন্মদাতা পিতার, এবং গর্ভধারিণী জননীর মনঃকষ্ট দিলে মহাপাপে লিপ্ততা হইতে হইবে। তুমি তোমার জনক জননীর একমাত্র পুত্র, দার পরিগ্রহ না করিলে উজ্জ্বলিত বংশটী বিলুপ্ত হইয়া

তিমিরাকারময় হইয়া পিণ্ডাধিকারী পূর্ব্ব পুরুষগণের অভি-সম্পাতে পরিণামে নরকযাতনাভাগী হইতে হইবে। হেমচন্দ্র, চঞ্চলিত হইও না, চিত্তকে সুস্থতা কর, ধৈর্য্যতা অবলম্বন কর, তুমি তোমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইবে, দার-পরিগ্রহ পূর্ব্বক সুখস্বচ্ছন্দতায় সংসার লীলা নির্ব্বাহিত কর। হেম-চন্দ্র বলিল আমি তাহা পারিব না কমল। কমলকুমারী বলিল আমিও তোমার সহিত কোথাও যাইব না। আমা হইতে তোমার বংশ লোপিত হইলে আমাকে মহাপাপগ্রস্ত হইতে হইবে। তোমার জন্য, তোমার বিচ্ছেদ এ জনমের জন্য জীবন সম্বরণ করিব তথাচও দুষিতা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। হেমচন্দ্র, তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া আর নিশানাথের শপথ করিয়া বলিতেছি আমার এ দেহ তোমাকে বিক্রিত করিয়াছি, এ জগতে হেমচন্দ্র ভিন্ন আর আমার কেহই নাই। হেম, প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ, গৃহে যাও, সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন কোরো, দাসীকে দিনান্তে একটীবারও মনে কোরো, জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা, পুনর্জ্জন্মে হেমচন্দ্রকে পতিত্বলাভের জন্য যেন নৈরাশ্য না হই। হেমচন্দ্র, আমি এ জনমের জন্য বিদায়। কমলকুমারী এই কথা বলিয়া বেগে ধাবমানাপূর্ব্বক ভাগীরথী জলে ঝম্প প্রদানে অদৃশ্য হইয়া গেল। কমলকুমারীর বিরহে অধৈর্য্য হইয়া হেমচন্দ্র কাতরে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, কমল, প্রাণের কমল, প্রাণেশ্বরী, আমায় একাকী রাখিয়া কোথায় গেলে। আমি তোমায় ছাড়িব না, আমার প্রাণের কমলকে একেলা যাইতে দিব না, এই বলিয়া হেমচন্দ্রও লম্ফপ্রদানে ভাগীরথী জলে নিমগ্নপূর্ব্বক সংসার লীলা সংম্বরণ করিল।

নবকুমারবাবুর বাটীতে এইবার হেমচন্দ্রের খোঁজ খবর পড়িয়াছে। প্রথমতঃ গৃহিণী চাঁপাবতী দাসীদের বলিলেন; হেমচন্দ্রকে অনেক সময়াবধি দেখি নাই কেন, বাহির বাটীতে আছে নাকি দেখিয়া আয় দেখি। দাসী বাহির বাটীতে হেমচন্দ্রকে না দেখিয়া ভৃত্যদিগকে বলিল, ক্রমান্বয়ে নবকুমারবাবুর কর্ণগোচর হইলে একটা মহা হুলুস্থূল হইয়া পড়িল। কিঙ্করগণের চারিদিকে ছুটাছুটী হুটাপাটি পড়িয়া গেল। অন্তঃপুরে কান্নাহাটির চোটে আর কেহ কাহারই কথা শুনিতে পাইতেছে না। বিবাহের সাজ শয্যা, ঝাঁক ঝমক পড়িয়া রহিল। রাত্রি প্রভাত হইল, বেলা চারিদণ্ড, কিঙ্করগণে কেহ নিরাশা হইয়া ফিরিয়া আসিল, কেহ অন্যদিকে ছুটিয়া চলিল। এখানে তারাবতীর বিষম বিভ্রাট, একেত প্রাণতুল্য কমলকুমারী কন্যা রত্নটি হারা হইয়াছেন, তার উপর নবকুমারবাবুর পীড়ন আশঙ্কায় ভীতা, ত্রাসিতা তারাবতী দেশত্যাগী হইয়া পলাইতা হইলেন। বীরেশ্বরপুরস্থ রমণীগণে পরস্পরে কাণাঘুসা হইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল কমলকুমারীটি ভাল মেয়ে যাই হোক, ডাকিনী কুহকিনীর মত ছেলেটিকে নিয়ে গেলগা। অন্য জনা বলিল ঠিক কথা বলেছিস্ বোন্, সোণার সংসারটা মাটি করে নিয়ে গেলগা। আর একজনা বলিল তা হবেই ত, বেটাছেলে উঠ্‌তি বয়েস, ছুঁড়ীর রূপে, যৌবনে মজে গিয়ে চলে গেছে। আর এক জনা বলিল, তা যাক না কেন, আজ হোক, কাল হোক, দু'দিন পরেই হোক ধরা পড়্‌তেই হইবে। নবকুমারবাবু ছেড়ে কথা কবেনা বাবা, মিন্‌সেটাকে যেমন জেলে দিয়েছে; মাগীটাকেও তেম্নি দেবে তবে ছাড়বে। আর জনা বলিল আর ভাই, কাকেই

যা ভাল বলি, আর কাকেইবা মন্দ বলি বল। নবকুমারবাবু ওতো আর ব্রাহ্মণ সজ্জন মান্‌ছেন না, লোকের জায়গা জমি, পুকুরটি পর্য্যন্ত বাজাপ্ত, শেষে বসত বাটীটি পর্য্যন্ত নিয়ে তবে ক্ষান্ত হচ্ছে। আরও বলি, কমলকুমারী মেয়েটির কই সে রকম ত স্বভাব চরিত্র ছিল না। মাটী বই অন্য দিকে চাইতে জানতনা, ভক্তি করে হাসিমুখে মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি কয়ে সকলকে সন্তুষ্ট কত্তো। তারির দোষ, কি ছোঁড়াটার দোষ তাইবা কে বল্‌তে পারে বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য বীণাঝঙ্কার বা মুক্তিলাভ।

বীরেশ্বরপুরের উত্তর সীমায় প্রায় ষষ্টক্রোশ অন্তরে একটি মহারণ্য, তথায় বহুকালাবধি কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্থাপিত ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির মধ্যে শৈলেশ্বরী নাম্নী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দিল্লী-শ্বর আকবর বাদশাহের স্বাধীনতাকালে মোগলপাঠানের হাঙ্গামার সময়, একদিবস রাত্র দ্বিতীয় যামার্দ্ধে একটী সৈনিক-পুরুষ ঘোটকারোহণে মন্দিরস্থ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে অতীব আশ্চর্য্যজনক দর্শন এবং শ্রবণ করতঃ ঘোটক হইতে অবরোহণপূর্ব্বক মন্দির মধ্যভাগে এক দৃশ্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। অতসী কুসুমবর্ণা ষোড়শী নবযুবতী দেবী-মন্দির আলোকিত করিয়া সুস্বরে বীণাঝঙ্কারে স্তুতি পাঠ্যে শৈলেশ্বরী মহাদেবীকে পরিতুষ্টা করিতেছেন। হরিণীদলে নিজ নিজ শাবক সন্নিহিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুমধুর বীণানিনাদে মুগ্ধ বা স্তব্ধ প্রায় রহিয়াছে। বীণাবাদিনী রূপ সম্পূর্ণা রমণীর লম্বিত কেশ

গুচ্ছ এলাইত, সর্ব্বাঙ্গে রত্নময় আভরণ সংযুক্তা, রক্তাম্বর পরিধানা, পরিচ্ছদাঞ্চল দ্বারায় স্কন্ধদেশ ঘেরিত বক্ষাবরণপূর্ব্বক কটিবন্ধন, কণ্ঠে রত্নময় কণ্ঠহার বিরাজিত। রমণী শৈলেশ্বরীর স্তুতি পাঠ সমাপ্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণীতা হইয়া গাত্রোত্থান করিলে সৈনিক বেশধারী ব্যক্তি নিকটস্থ হইয়া রমণীর প্রতি বলিল, দেবী! কোনরূপ দোষজনক না হইলে করুণাদানে নিজ পরিচয়টি দিয়া অধীনের কুতূহল নিবারণ করিতে আজ্ঞা হয়। রমণী বিশালিত নেত্রদ্বয়ে আগন্তুকের প্রতি কটাক্ষপাতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, অপরিচিত হইয়া কূল কন্যার পরিচয় চাহিতে তোমার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা হইল না। পুনশ্চয় এরূপ দুরাভিলাষিত বাক্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করিও না, আমি অদ্য তোমায় ক্ষমা করিলাম। আগন্তুক ঈষদ্ হাস্যে বলিল, আমি পুরুষ, আপনি রমণীরত্ন, আমার প্রতি আপনার ক্ষমার বা শাসনের অধিকার আছে। নিজগুণে চন্দ্রাননে আমায় ক্ষমা করিয়াছেন, এইবার আমি আপনার নিকট নির্দ্দোষিত হইলাম। তবে এইবার সরলমনে, হাস্যবদনে সুখময় পরিচয় প্রদানে আমার চাঞ্চলিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করুন। মন্দির বাসিনী রমণীর মৃগনিন্দিত নয়ন দুইটি ক্রোধে অরুণাবর্ণা হইল, যুবতী পুষ্প বিকশিত বিটপিসম কোমলাঙ্গখানি আস্ফালিত করিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, যাথ্ দুরাত্মন্ নরপিশাচ, রে পুরুষাধম, নিশাকালে নির্জ্জনারাণ্যে সহায় হীনা রমণী পাইয়া সাহসিকচিত্তে আমার প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ কচ্চিস্ ইহা মনেও স্থান দিস্নে যে নিকৃষ্টা রমণীর ন্যায় তোর জানুস্থিত কোষবদ্ধ অসি দেখিয়া ভীতা হইবে, এবং অবাচ্য বাচ্য সকল সহ্যতা করিয়া ঐ ঘৃণিত

পৈশাচিক দেহে বিলাস জন্য স্পৃহান্বিত হইবে। চণ্ডালের সুধাপান ইচ্ছাসম তোর নিতান্তই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। জড়ধী পক্ষী সকল যেমন ধান্য ক্ষেত্রে অনিচ্ছুক হইয়া নারিকেল ইচ্ছুক চঞ্চুভগ্ন করিয়া অনাহারে জীবনত্যাগ করিয়া থাকে, এবং পতঙ্গ দলেও যেমন বর্ষান্বিতে প্রদীপ্ত দীপশিখায় পড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ তুই নিশ্চয়ই জানিস্ এই মহা-কুলোদ্ভবা রমণীর হস্তে তোর ঐ পাপ জীবনের অন্ত পরিশেষ হইবে। আগন্তুক পুনশ্চয় মৃদুহাস্যে বলিল, মরাল গমনা, সুধাংশু বদনা দিব্যাঙ্গনার সহবাস লাভে মরণও মঙ্গলজনক। আগন্তুকের ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য শ্রবণে শরবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় চঞ্চলিতে অর্থাৎ ক্রোধিতচিত্তে মন্দিরাভ্যন্তর হইতে কোষবদ্ধ অসি আনিত পূর্ব্বক, ঝলকিত অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, তোর নিতান্তই মৃত্যু সময় নিকটস্থ, সেইজন্যই হিতাহিত রহিত হইয়া পঙ্গুর জলধিলঙ্ঘন সম দুরাভিলাষিত হইয়াছিস্। তুই ভেক হইয়া ভূজঙ্গের মস্তকস্থিত মণি লভিবার লালশায় আক্রমণ করিয়াছিস। রমণী করস্থিত অসিখণ্ডের অগ্রভাগ মন্দির বহির্দ্দেশে অগ্রসর করিয়া বলিলেন রে নর-পীশাচ, ঐ দেখ! তোরসম দুর্ব্বৃত্তগণের এই অসিখণ্ডের দ্বারায় এই বীর কন্যা বীরাঙ্গনার হস্তে কিরূপ দুরাবস্থা ঘটীয়াছে।

সৈনিক বেশধারী আগন্তুক রমণীর কথিত এবং শঙ্কিত স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক যাহা দেখিল তাহা অতীব ভয়াবহ ব্যাপার। দশজনা প্রকাণ্ডকায় পুরুষ মস্তকহীন শরীরে ভূমিস্মাৎ এবং দশটী ছিন্ন মস্তকও তদসন্নিদ্ধ পতিত রহিয়াছে। ঐরূপ ভীষ-

পতা কান্ত দেখিয়া, বিস্ময়ে, ত্রাসে, কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আগন্তুক বিনয় সহকারে রমণীর প্রতি বলিল, দেবী! কোন অপরাধ জন্য আপনা কর্তৃক ইহাদের মস্তক ছেদন হইয়াছে, যদি বাধা না থাকে তবে ইঁহার প্রকৃত কারণটি বলিয়া আমার প্রতি আপনার ইচ্ছানুরূপ শাস্তিবিধান করুন। রমণী বলিলেন, তোমার মত নরাধমের সহিত বেশী কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। আগন্তুক বলিল মহৎজনমাত্রেই দণ্ডার্হ ব্যক্তির কোন বিষয় হউক একটি প্রার্থনীয় সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। রমণী বলিলেন ঐ ছেদিত মৃতব্যক্তিগণ ডাকাইতি করিয়া থাকে। এক রাত্র আমি দেবীর অর্চ্চনার জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এই সময় উহারা এইস্থানে উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি নেত্রপাত মাত্রেই সকলে অট্টহাস্যে কহিল আজ ভাই আর কোথাও যাইতে হইবে না, শৈলেশ্বরী মায়ী এইখানেই শীকার মিলাইয়াছে। তাহাদের অন্য একজন অকথ্য সম্ভাষণে বলিল সুন্দরী, গহনার দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া ঐ গুলি আমাদের খুলিয়া দাও। অন্য জনা বলিল, আমরা প্রত্যহ রাত্রি সময় দেবীপূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যাই, তা আজ আর আমাদের বেশী মেহনত কর্ত্তে হলনা, তোমার গায়ের ঐ গুলি হলেই বেশ হবে। আমি সহাস্যে বলিলাম ইচ্ছাপূর্ব্বক না দিলে তোরা মারিয়া ধরিয়া কাড়িয়া লইবি নাকি। অন্য জনা বলিল না দিলে তাতো আছেই, তা হয়েও আবার অন্য রকম হবে। আমি বলিলাম দেথ দুর্ব্বৃত্তগণ দুর্ভাষা প্রয়োগ করিলে এই মুহূর্ত্তেই আজীবন জন্য ডাকাইতি সাধ মিটাইয়া দিব। আজ তোরা দেবীপূজা এবং দস্যুতার আশা পরিত্যাগ কর। আমার অর্চ্চনার সময় অতিবাহিত

হইয়া যায়। আমাকর্ত্তৃক শৈলেশ্বরীর অর্চ্চনা, বন্দনাদি পরিশেষ হইতে রাত্রে ষষ্ঠ যমার্দ্ধ প্রায় হইবে, তাহা হইলে তোদের সকল কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে। অন্য জনা ডাকাইতি বলিল গায়ের ঐ গুলি আর তোমাকে পাইলেই আমাদের অন্য কাজে দরকার নাই। ঐরূপে অসহ্য কুবাক্য সকল প্রয়োগ করিলেও উহাদিগকে নানারূপ উপদেশ দ্বারায় বুঝাইয়া ও সান্ত্বনা করিতে পারিলাম না। অর্চ্চনার সময়ও উত্তীর্ণ হয়, এদিকে দুর্ব্বৃত্তগণ আমার অঙ্গস্পর্শ করিতে উদ্যত হয়, উভয় সঙ্কটে পড়িয়া এই অসি দ্বারায় দুর্জ্জনগণের চিত্তবৃত্ত অপহরণ করিয়াছি। আগন্তুক এইবার হাস্য মুখে বলিল, ঐ জন্যই আপনি ঐরূপ গর্ব্বতা প্রকাশ কচ্ছেন, পশুবৎ দস্যু কয়টীকে হত করিয়াছেন বলিয়াই যে রাজপুত বংশীয় সৈন্যের নিকট কোন দিকে অব্যাহতি পাইবেন ইহা মনেও করিবেন না। রমণী ক্রোধে, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, দেবী শৈলেশ্বরী ভগবান চন্দ্রদেব, মা সর্ব্বান্তর্য্যামী বনদেবী, ধরিত্রীদেবী আপনারা সাক্ষ্য, মহারাজ ধীরেন্দ্রসিংহের পুত্র, দিল্লীশ্বরের সেনাপতি, বীরকেশরী যুবরাজ বীরধ্বজসিংহের সহধর্ম্মিণীর প্রতি কটূক্তিকারী নরাধমকে বিনাশ করিতে আসি নিষ্পাপী নির্দ্দোষী, এই বলিয়া রমণী অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ তেজস্বিনী হইয়া অসি উত্তোলনে উদ্যত হইলে আগন্তুক ভূলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রমণীর প্রতি বলিল মা, আমি আপনার দুষ্ট সন্তান, এ দুরাচারের শীঘ্র মস্তকচ্ছেদন করুন। বীর প্রবর যুবরাজ বীরধ্বজসিংহের কিঙ্করানুকিঙ্কর আমি একটী সামান্য সৈনিক, নরাধমের নাম সুন্দর সিংহ। জননী, আপনার কুপুত্ররূপ চণ্ডালাধম। এ অধমের পাপে ধরিত্রীদেবী ভারাক্রান্ত হইয়াছেন। পৃথিবী

হইতে আমায় দূরীভূত করুন। ঘোর নরক ভিন্ন আর অন্যেত্র গতি নাই।

রমণী বিস্ময়ান্বিত কোষে অসি পরিবর্দ্ধিত করিয়া বলিলেন অহো! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছিলাম। সৈন্যটীর নাম সুন্দর সিংহ, সুন্দরকে বলিলেন, বাবা ওঠো, এ বিষয়ে তুমি কিছু মাত্রই অপরাধী নও, কেবল আমিই সম্পূর্ণরূপে দূষিত। কারণ তুমি পরিচয় চাহিবামাত্র, বিশেষরূপ জ্ঞাত করিলে কিছু মাত্রই কথান্তরিত হইত না। কেবল আমারই অজ্ঞানতাক্রমে এতদূর বাদানুবাদে সমূহ বিপন্নতা ঘটিয়াছিল। সুন্দরসিংহ দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, জননী রাজমহিষী! আপনি এ অগম্যস্থানে কি কারণ বশতঃ এবং কতদিন আসিয়াছেন। রমণী বলিলেন, তোমাদেরই অন্বেষণে অদ্য হইতে একপক্ষ হইল এইস্থানে আসিয়াছি। রাজপুত্র এখন কোথায়? সুন্দর-সিংহ নতবদনে মৃদুস্বরে বলিল, জননী, সে কথা আর কেমন করিয়া বলিব, হৃদয় বিদরিত হইতেছে, প্রাণ ব্যাকুলিত, জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি। যুবরাজ এখন দুরাত্মন কুতবদ্দীনের অধী-নস্থ বন্দী, অস্ত্রাঘাতে সকল শরীরই ছিন্ন ভিন্ন, রাজপুত্র রুগ্ন শয্যায় শায়িত। বীরধ্বজসিংহ বন্দীগ্রস্ত শুনিয়া রমণী স্পন্দহীনা প্রায় নয়নাশ্রু বর্ষণে কিয়ৎ সময় অতিবাহিত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, রাজপুত্র বন্দী— যবনাধীনে বন্দী, মদমত্ত হস্তী ভেকের কবলিত, কালের গতিই কি বিচিত্র। এখন শারীরিক অবস্থা কিরূপ, তাহা কি বলিতে পার। সুন্দরসিংহ বলিল জননী যুদ্ধে পরাস্ত অবধি আমরা কয়েকজনা মাত্র সৈন্য কেবল গোপনভাবে সাবধানতায় আছি, বাদসাহের নিকট সংবাদ

পাঠান হইয়াছে, সময় ক্রমে অধিকরূপে সেনা সংগ্রহ করিয়া একটী সেনাপতি আসিবেন। পরম্পরে সংবাদ পাই আমাদের রাজপুত্র অত্যান্তিক দুর্ব্বলাবস্থা, আরোগ্য-লাভ হইলে নবাব যবনাধম কুতবুদ্দীনের নিকট বিচার হইবে। এই বলিয়া বদ্ধা-ঞ্জলিতে রমণীর প্রতি বলিল জননী, কিঙ্করের প্রতি এখন কি আদেশ হয়। রমণী বলিলেন তুমি এখন যথাস্থানে গমন কর, রাত্র অধিক হইয়াছে, আর বিলম্ব করিও না। রমণীকে বন্দনা-পূর্ব্বক ঘোটকারোহণে সুন্দরসিংহ বেগে প্রস্থান করিলে, রমণী তদ্দণ্ডেই শৈলেশ্বরী দেবীকে প্রণীতা হইয়া মন্থর গতিতে বন বিভাগ দিকে গমন করিলেন।

দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি ধীরেন্দ্রসিংহের মৃত্যুর পর তদ্‌-পুত্রকে বাদসাহ ঐ পদেই অভিষিক্ত করেন। মোগল পাঠানের হাঙ্গামা সময় পাঠান কুতবুদ্দীন খাঁ ক্ষীরশা নামক গ্রামে প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে বাস করিয়া গ্রামে গ্রামে লুটপাট করিতে আরম্ভ করিলে ঐ সময় দিল্লীশ্বরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বীর জয়সিংহ কথঞ্চিত সৈন্য সমভিব্যাহারে, শৈলেশ্বরী স্থাপিত অরণ্যমধ্যে একটী শিবির সংস্থাপন করিয়া পাঠান বিনষ্টের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এবং মধ্যে মধ্যে দিল্লী গমনাগমন হইত এইরূপে প্রায় অষ্টমবর্ষ অতীত হইল ইতি-মধ্যে বীরেশ্বরপুর গ্রামে অতুলনীয় রূপ-সম্পন্না শৈলেশ-নন্দিনীকে দেখিয়া উহার পাণিপরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপরে শ্বশুরালয়েও প্রায় গমনাগমন হইত। পাঠান পরাভূত করিয়া দিল্লী যাত্রা-কালে শৈলেশ-নন্দিনীকে নিজালয়ে লইয়া যাইব, এইটিই মনে

ধারণা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অসাবধানতাতেই হউক,—কিম্বা সামান্য সৈন্যের কারণেই হউক পাঠান সমরে পরাজিত এবং নবাব কুতবদ্দীনের নিকট বন্দী। শৈলেশ-নন্দিনীও স্বামীর তত্ত্বাবধানে বাটি হইতে বাহির হইয়া শৈলেশ্বরীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্য স্বামীর বিপন্নতা শুনিয়া এই রাত্রিকালে বনমধ্য দিয়া কোথায় যে চলিয়া গেলেন, তাহা তিনিই জানেন।

নবাব কুতবদ্দীন খাঁর বাটীর একটি কক্ষে পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বীরধ্বজ সিংহ শায়িত। হকিম্ বারম্বার নাড়ী দেখিতেছে। নবাব কন্যা শোলেমানী আপন সহচরী গোয়েন্দা সমভিব্যাহারে রাজপুত্রের সুশ্রূষায় নিযুক্তা। শোলেমানী হকিমের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এইবার কিরূপ দেখিলেন। হকিম্ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। শোলেমানীর চক্ষু দিয়া টশ্ টশ্ করিয়া জল পড়িল। আপন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মঞ্চন করিয়া রাজপুত্রকে ডাকিলে, রাজপুত্র কথা কহিতে পারিলেন না, কেবল তিলেক মাত্র চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই মুদ্রিত করিলেন। নবাব কন্যা গোলাপদান দ্বারায় রাজকুমারের চক্ষে গোলাপ সিঞ্চন করিলেন, কিন্তু পুনশ্চয় চাহিলেন না। হকিম বলিল ক্রমান্বয়ে সকল ইন্দ্রিয়ই অবসন্নতাপন্ন হইয়া আসিল, আর জীবন রক্ষার উপায় দেখিতেছি না, সাধ্যমত চেষ্টিত হইয়াও কেবল দুরাদৃষ্ট ক্রমে দুর্নামের ভাগী হইলাম, আর রাজকুমারী তোমারও সকল কষ্ট নিষ্ফলিত প্রায়! এখন সেই শাঙ্কেতিক বৃক্ষটির কয়েকটি পত্র আনিয়া দিলে অন্য একটি ঔষধ খাওয়াইতে ইচ্ছা করি। বৃক্ষপত্র আনিবার জন্য গোলেন্দা ত্রস্তান্বিতে গমন

করিলে, নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে শোলেমানী রাজপুত্রকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, ঘোরতমসাময়ী রজনীর বিকটাকার মূর্ত্তিতে পন্থাদিগকে ত্রাসিতময় করিতেছে। গোলেন্দা পত্র লইয়া ফিরিয়া আসিল। উহা হকিমের হস্তে দিয়া নবাবপুত্রীকে বলিল, দাখ সহচরী! আমাদের উদ্যানে বৃক্ষতলে বসিয়া একটী অসামান্য রূপবতী রমণী একক বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। এরূপ অন্ধকার রজনীতেও তাঁর অঙ্গরশ্মীতে যেন আলোকময় হইয়াছে। আমি পরিচয় চাহিলে তিনি আমায় বলিলেন, আমি ভিখারিণী! তিনি আমার নিকট এই বৃক্ষপল্লবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে যুবরাজের রোগাক্রান্তের কথা বলিলে তিনি বলিলেন, এই পত্র দ্বারায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ক্ষত অঙ্গে স্পর্শ বা পান করাইবা মাত্র বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম আপনি কি চিকিৎসার বিষয় অবগত আছেন। রমণী বলিলেন হাঁ, বিশেষরূপেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কণ্ঠস্থ হইয়াছে। তোমাদের রুগ্নব্যক্তিকে দর্শন মাত্রেই ভালমন্দের বিষয় বলিতে পারিব। তাঁহার সুধাময় উৎসাহিত বাক্যে হর্ষান্বিতে তোমার নিকট প্রস্তাবনা করিতে আসিলাম। সখি! তাঁহাকে সাদরে বিনয় সম্ভাষণে লইয়া আইস। শোলেমানী এই কথা বলিলে, গোলেন্দা পুনর্ব্বার উদ্যানাভিমুখে গমন করিয়া কিয়ৎ সময় পরেই ভিখারিণী সহিতে উপস্থিত হইল। রাজপুত্রী ভিখারিণীর রূপ দর্শনে বিমোহিতা হইয়া সাদর সম্ভাষণে বলিল, আসিতে আজ্ঞা হয়, আসুন, একটী উচ্চাসন অগ্রসর করিয়া

বলিল আসন পরিগ্রহ করুন, আপনি মানবী না দেবী, পরিচয় চাহিতে পারি কি? শোলেমানী এই কথা বলিলে, ভিখারিণী বলিলেন, আমি ভিখারিণী, সামান্য মানবী, আপনি নবাব কন্যা হইয়া ঐরূপ বিনয়তা বাক্যে আমায় লজ্জান্বিতা করিবেন না। শোলেমানী বলিল, আপনি সামান্যা রমণী, এই কথাটী শুনিয়া আমার যেন স্বপ্নবৎ চিত্তভ্রম হইতেছে। নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি আপনি উচ্চকুলোদ্ভবা কোন প্রতাপান্বিত মহাত্মার রমণী। ভিখারিণী বেশে কোন ভিক্ষার জন্য যে পরিভ্রমণ করিতেছেন তাহা আপনিই জানেন। যাহাই হউক সানুগ্রহে যদি পদার্পণ হইয়াছে, তবে রুগ্ন রাজপুত্রের ব্যবস্থা অবধারিত করিয়া আমাদের বাধিত করুন। ভিখারিণী বলিলেন, পরোপকারই আমার প্রধান ধর্ম্ম, তজ্জন্য আপনি অনুনয় করিবেন না। এই বলিয়া ভিখারিণী ভিক্ষার ঝুলি হইতে ঔষধ বাহির করিয়া একটী পাত্রোপরি উহা জল মিশ্রিত পূর্ব্বক, বীরধ্বজ সিংহকে কিয়ৎদংশ পান করাইয়া শেষাংশ ক্ষতস্থানে প্রলেপন করিলেন। ঔষধ উদরস্থ মাত্রেই বীরধ্বজ সিংহ চক্ষু উন্মীলন করিলেন, এবং স্পষ্টস্বরে বলিলেন, প্রাণ যায়, জল্ জল্ দাও। ভিখারিণী ত্রস্তান্বিতে রাজপুত্রকে সুশীতল বারি পান করাইলে, রাজপুত্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন প্রাণ যায়, ক্ষত শরীর সমস্তই প্রজ্বলিত অনল সম দগ্ধীভূত হইতেছে, প্রাণ যায়, ভিখারিণী হীরকমণ্ডিত ব্যজনী দ্বারায় রাজপুত্রকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণবিলম্বেই যাতনা নিবারণ হইল। রাজপুত্র সুস্থতা লাভ করিলেন সুস্থিরতা চিত্তে ভিখারিণীর প্রতি বারম্বার চাহিতে লাগিলেন, যেন কি বলিবেন, অথচ কিছুই বলি-

ছেন না; ভিখারিণীর অদ্ভুত চিকিৎসা সন্দর্শনে হকিম লজ্জিত হইয়া বিদায় হইলেন। গোলেন্দাও কার্য্যবশতঃ অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিল। রুগ্ন বীরধ্বজ সিংহের প্রতি ভিখারিণী মৃদুস্বরে কহিলেন, কেমন, এখন আপনার শারীরিক কোনরূপ অসুখ আছে কি? রাজপুত্র বলিলেন, অন্য যন্ত্রণা আর কিছু নাই, কেবল ক্ষুধাতে অস্থির হইতেছি। রাজপুত্রের ক্ষুধা হইয়াছে শুনিয়া নবাবপুত্রী আনন্দে পুলকিত হইয়া খাদ্য আনয়নে গমন করিলেন। এইবার বীরধ্বজ সিংহ ভিখারিণীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন শৈলেশ নন্দিনী, তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে। পাঠক! এইবার ভিখারিণীর পরিচয় পাইলেন, ভিখারিণীই শৈলেশ-নন্দিনী। শৈলেশ-নন্দিনী আপন স্বামীর প্রতি একটু সোহাগিনী হইয়া বলিলেন, যাহার যেস্থানে অধিক আবশ্যক হইয়া থাকে, অতি অগম্য স্থান হইলে যেরূপেই হউক তাহাকে সেস্থানে যাইতে হয়, কিন্তু নিষ্ঠুর জনার পক্ষে তাহা নয়। বীর-ধ্বজ সিংহ শৈলেশ-নন্দিনীর প্রতি বলিলেন বাদশাহের কার্য্যে আসিয়াছি, হঠাইত যুদ্ধ উপস্থিত হইল, বিস্মরণক্রমেই হউক বা সময়াভাবেই হউক তোমায় সংবাদ দিতে পারি নাই, সেজন্য আমার উপর দোষ রোপণ করা তোমা সম রমণীর সঙ্গতযুক্ত নয়। শৈলেশ্বরী বলিলেন, আমি কি বাদসাহের কার্য্যে বাধকতা হইতাম। রাজপুত্র বলিলেন, বাধকতায় হইত না, আর আমায় যবন করালগ্রস্ত হইতেও হইত না। শৈলেশ-নন্দিনী। তুমি সকলই জান, সকলই বুঝিতে পার, তোমায় আমি বুঝাইব কি। প্রারব্ধ দোষেই এই সকল ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, তোমার এই স্থানে আসিবার কারণ আমি বুঝিয়াছি, আমায় আরোগ্য করিবার

জন্য তুমি আসিয়াছ। কেন শৈলেশ-নন্দিনী তুমি এখানে আসিলে, কেন অভাগাকে বাঁচাইলে, আমার মরণই শ্রেয়। শৈলেশ-নন্দিনীর চক্ষুদুটীতে টশ্ টশ্ করিয়া জল পড়িল কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর প্রতি বলিলেন, একে মর্ম্মপীড়ায় জ্বলিয়া মরিতেছি, তাহার উপর পুনশ্চয় ঐরূপ নিষ্ঠুরতা বাক্যে জ্বালাইবে। তোমাকে দেখিতে আসিব না, আরোগ্য করিব না, তোমার যত্ন সেবা করিব না, ভালবাসিব না, তবে আর কাহাকে বাসিব। স্ত্রীজাতির স্বামীধন ভিন্ন আর কি ধন আছে। তুমি বই এ জগতে আর আমার কে আছে। সাধ্বী রমণীর ঐকান্তিক চিত্তে স্বামীসেবা করিলে, দেবসেবার অধিক ফল লভিয়া থাকে তুমি আমার হৃদয়াধিষ্ঠিত দেবতা, স্বপনে, জাগ্রতে, জ্ঞানে, অজ্ঞানে ধ্যানে তোমাকেই মানসপটে দর্শন বা স্মরণ করিয়া থাকি। তুমি আমার স্বামীরূপ কল্পতরু, আমি তোমার পত্নীরূপ আশ্রিতা লতিকা, তোমা অবলম্বনেই জীবন ধারণ করিয়াছি। তোমার অমঙ্গল জনক বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিলে, এ প্রাণে কিরূপ বেদনা হইয়া থাকে। তাই বলি নিদারুণ বাক্যে আর আমায় জ্বালাই না।

বীরধ্বজ সিংহ বলিলেন দেখ, শৈলেশ-নন্দিনী। তোমায় মনকষ্ট দিবার জন্য ওকথা বলি নাই। আমি যথারূপে আরোগ্য লাভ করিলেই, যবনাধম কুতবদ্দীন নিশ্চয় বিচারে আমার শিরচ্ছেদে অনুমোদন করিবে। শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, সেজন্য তিলেক মাত্রও তুমি চিন্তান্বিত, কি ত্রাসিত হইও না। নবাবের বাক্য যদি সত্য হয়, আর দেববাক্য যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আর দিবারাত্র হইবে না, চন্দ্রসূর্য্যের

সমুন্নতিও থাকিবে না। যবনহস্তে সনাতন ধর্ম্ম রাজপুত বংশীয়া পতিব্রতার পতি হারাইবে ইহা স্বপ্নেও ভাবিও না, আর একটী কথা, নবাবপুত্রী খাদ্য লইয়া আসিলে কোন কারণ বশত আমি স্থানান্তরে যাইব। বীরধ্বজ সিংহ বলিলেন আবার রাত্রিকালে কোথায় যাইবে। শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, যেজন্য যাইব রাত্র ভিন্ন দিবা বিভাগে সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না। এই কথা বলিতে বলিতে শোলেমানী স্বর্ণময় পাত্রোপরি সুবাসিত খাদ্য এবং স্বর্ণগেলাসে সুশীতল বারি লইয়া, কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অতীব যত্ন সহকারে, সাদর সহকারে রাজপুত্রকে আহার করাইলেন। শৈলেশ-নন্দিনী সোলেমানীর প্রতি বলি-লেন, নবাব কন্যা! তোমাদের রাজপুত্র এইবার আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, আর কোনই চিন্তা নাই। এখন আপনার অনুমতি হইলে আমি বিদায় হই। সোলেমানী বলিল, এই অন্ধকারময় রাত্রিকালে আপন কুলরমণী হইয়া কোথায় যাইবেন। আপনি রাজপুত্রের জীবন দান দিয়া আমায় যে কত দূর আপ্যায়িত করিয়াছেন তাহা কি পর্য্যন্ত বলিব, সেজন্য আপনাকে সম্ভোষিত করিতেও আমি অক্ষমা। কারণ আমি অজ্ঞানা, অবলা, অকৃত-জ্ঞতা রমণীমাত্র, স্তুতি বচনে, কি রত্নদানে কি রাজ্য অর্পণে কিরূপে যে আপনাকে পরিতোষ করিব তাহা অবধারিত করিতে পারি না। অন্য কথা কি আপনাকে এ জীবন অর্পণ করিলেও আমার মনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। আপনি দেবী, কি মানবী, কি গান্ধর্বী তাহা আপনিই জানেন। নিজমুখে বলিয়াছেন আমি ভিখারিণী। তাহা প্রকৃতই হউক বা অপ্রকৃত হউক, আমি অঙ্গীকৃত হইতেছি কিঞ্চিৎ জায়গীর অর্পণে আপ-

নার ভিখারিণী নামটি বিলুপ্ত করিব। অদ্য এই রাত্রিকালে আপনাকে যাইতে দিব না। এ আবাসে কিয়দ্দিবস অবস্থিতা হইয়া আমার আশাতৃষ্ণা নিবারিত করিতে হইবে। ফুল্লকমল সদৃশ হাস্যবদনে সোলেমানীর চিবুকটী ধরিয়া শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন নবাব কন্যা! আজ হইতে তুমি আমার ভগিনী হইলে তোমার বিনয়ান্বিত মধুসম সুমিষ্ট বাক্যাবলী শুনিয়া আমি যারপর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ধনরত্ন বা অন্য কোনরূপ ঐশ্বর্য্যে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, ভগিনী! তোমায় ভগিনী বলিয়াছি, তুমি সুখে থাক, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। একটী বিশেষ কার্য্য জন্য এখনই আমায় যাইতে হইবে। তোমাদের রাজপুত্রের জন্য অন্য একটী ঔষধ লইয়া কল্য দিবাভাগে আসিব। এবং সময়ে সময়ে তোমায় দেখিতে আসিব। যাহা দেখিবামাত্র দ্বার-পালগণ নির্ব্বাদে দ্বারমোচন করে, তদনুরূপ একটী সাঙ্কেতিক দ্রব্য পাইলেই সন্তোষিত হই। নবাব কন্যা আগ্রহান্বিতে আপনার করা-ঙ্গুলী হইতে একটী হিরকময় অঙ্গুরী লইয়া আদৃতা সহকারে শৈলেশ্বরীর অঙ্গুলে পরাইয়া বলিল দিদিমণি আপনার হস্তে ইহা দেখিলে, এই দুর্গস্থ যাবতীয় ব্যক্তি আমা অপেক্ষাও আপনাকে প্রভুসম ভক্তি করিবে। শৈলেশ-নন্দিনী অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইয়া হর্ষচিত্তে মৃদুহাস্যে সোলেমানীর গ্রীবা ধারণ করিয়া, বীরধ্বজ সিংহের প্রতি নয়ান ভঙ্গি করিয়া বিদায় হইলেন।

যুবরাজ বীরধ্বজ সিংহের সেবা সুশ্রূষায় নিবৃত্ত নবাব কন্যা এবং গোলেন্দা এই উভয়ে একজনা অর্দ্ধরাত্র নিদ্রা যাইত, এক জনা জাগ্রত থাকিত। অদ্যরাত্রও সেইরূপ হইল। পরদিবস শৈলেশ্বরী আসিলেন, রাজপুত্রকে ঔষধ পান করাইলেন। বীর-

ধ্বজসিংহ বিশেষরূপে আরোগ্য হইলেন। শারীরিক স্বস্থ্যবস্ত হইয়া দিনে দিনে স্বর্ণকান্তী উজ্জ্বলিত হইল। আজ কুতবদ্দীনের দুর্গমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়াছে। সকলেই শশঙ্কিত ত্রস্থ্যান্বিত। রাজকুমার বীরধ্বজের বিচার হইবে। আজ শৈলেশ-নন্দিনী দুর্গমধ্যে অবস্থিতা আছেন, আপন স্বামী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বীরধ্বজ সিংহ আপনার পত্নীর প্রতি বলিলেন, শৈলেশ! আজ এখনও তুমি যাও নাই?

শৈ। কোথায় যাইব?

বী। যে স্থানে প্রত্যহ যাইয়া থাক।

শৈ। আজ সেখানে একক যাইব না, স্বামী সহিত যাইব। বীরধ্বজ সিংহ মস্তক অবনত পূর্ব্বক বিন্দুমাত্র নেত্রবারি বর্ষণ করিলেন। বলিলেন শৈলেশ-নন্দিনি! দুর্দ্দান্ত কুতবদ্দীন হইতে আজি যে তোমার সতীত্বকতা বিনষ্ট হইবে।

শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, তাহা হইলে আজি হইতেই কি সতীবাক্য তিরোহিত হইবে। এই সময় সশস্ত্রিক বেশে নবাব প্রেরিত দুইজনা অনুচর আসিয়া, উভয়ে বীরধ্বজ সিংহের উভয় হস্ত ধরিয়া বিচার স্থলে গমন করিল।

নবাব কুতবদ্দীন শমনসদৃশ বিকটাকার মূর্ত্তিতে বিচারাসনে উপবেশন করিয়াছেন। নীরবে, নিস্পন্দ, উভয় পার্শ্বে দুইটী মন্ত্রী বিরাজিত। ন্যাঙ্গা তলোয়ার হস্তে প্রহরীগণ প্রহরী-কার্য্যে নিয়োজিত। বিদ্রোহী বীরধ্বজ সিংহ সম্মুখাগত হইলেন।

বীরধ্বজ সিংহের প্রতি নবাব কুতবদ্দীন বলিলেন, রাজকুমার! আপনার প্রতি একটী প্রস্তাবনা করিব, তাহা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন কি? রাজপুত্র বলিলেন, আপনার প্রস্তা-

বনার অগ্রেই অঙ্গীকার করিতে পারি না। নবাব বলিলেন বাদ-সাহের নিকট আমার কথিতানুযায়িক আপনি একটী সন্ধিপত্র পাঠাইতে পারেন কিনা? রাজপুত্র বলিলেন সন্ধিপত্রের মর্ম্ম কিরূপ? নবাব বলিলেন, আমি তাহার অধিকারভুক্তে হস্তক্ষেপ করিব না, এবং তিনিও আমার সীমাবর্ত্তিতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, যুব-রাজ বলিলেন, দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সন্ধিপত্রের প্রত্যুত্তর আসিবার পরে আমার বিচার হইবে, না অগ্রেই হইবে। নবাব বলিলেন, পরেই হইবে। আর আপনার সাক্ষরিত সন্ধিপত্রে বাদসাহ ব্যস্ততার সহিত অনুমোদন করিবেন। তাহা হইলে আর বিচারে প্রয়োজন কি, বরঞ্চ বন্দিত্য কারণ আপনার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিব। যুবরাজ বলিলেন, তাহা হইলেই দিল্লীশ্বর জানিবেন হীনবল বীরধ্বজ সিংহ প্রাণভয়ে নবাব সাহেবের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সন্ধিপত্র পাঠা-ইয়াছে। নবাব বলিলেন, তাহাই যদি আপনার অনুভব হয়, তবে স্বয়ং দিল্লী গমন করিতে পারেন। যুবরাজ স্বদর্পে বলি-লেন, দিল্লীশ্বর আমার সন্ধি স্থাপনার জন্য পাঠান নাই, পাঠান-দলনের জন্য পাঠাইয়াছেন। এখন আমি বিচার স্থলে আনীত হইয়াছি, অগ্রে বিচারে যাহা হয় হউক, বীর-শ্রেষ্ঠ রাজপুত বংশীয় প্রাণের আশঙ্কা রাখে না। রাজপুত সিংহ শৃগাল সম পাঠানকে ভ্রূক্ষেপও করে না। আপনার প্রাণে আতঙ্ক হইয়া থাকে, স্বয়ং দিল্লী যাত্রা করিয়া দিল্লীশ্বরের পদানত হইতে পারেন।

নবাব কুতবদ্দীনের চক্ষুদ্বয় রক্তিমাবর্ণ হইল। ক্রোধে কম্পা-ন্বিতে অঙ্গাস্ফালনে, গম্ভীরস্বরে বীরধ্বজ সিংহের শিরচ্ছেদনে

অনুমোদন করিলেন। দুইজনা জল্লাদ রাজপুত্রকে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক উভয়ে উভয় হস্ত ধরিয়া বধ্যভূমিতে গমন করিল।

মহারাজ ধীরেন্দ্র সিংহের পুত্র যুবরাজ বীরধ্বজ সিংহের মস্তক ছেদন হইবে। ক্ষীরশাগ্রামে হুলস্থুলময়। কেহবা দেখিবার জন্য ছুটাছুটী করিতে লাগিল, কেহবা ত্রাসে, মমতায় বাটীর বাহির হইল না। প্রতি গৃহে রমণীগণে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কান্দিতে লাগিলেন। স্বামীর মস্তক ছেদন হুকুম হইল শুনিয়া, শৈলেশ-নন্দিনী ত্রস্তান্বিতে ছাদে আরোহণ করিয়া, আপনার কটিদেশ হইতে একখানি নীলাম্বর বাহির করিয়া উর্দ্ধপথে কিয়ৎ সময় সঞ্চালনা পূর্ব্বক, ছাদ হইতে অবারোহণ করিয়া, নবাব কুতবদ্দীনের অস্ত্রাগার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। শৈলেশ-নন্দিনীর করাঙ্গুলীতে সোলেমানী দত্তা অঙ্গুরীয় দেখিয়া বিনীত বাক্যে দ্বাররক্ষক বলিল, জননী! কুলকন্যা হইয়া অস্ত্রালয় দ্বারে কি অভিপ্রায়ে সুভাগমন? শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, তুমি কি আমার কোনরূপ আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইতে পার। দ্বার-রক্ষক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল ঐ অঙ্গুরীয় প্রভাবে আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। শৈলেশ নন্দিনী বলিলেন, একবার শীঘ্র দ্বার মোচন কর। দ্বারপাল কর্ত্তৃক দ্বারমুক্ত হইলে, শৈলেশনন্দিনী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আপন কাঁচলী দ্বারায় কঠিনতারূপে কটিবন্ধন করিয়া, কোষ হইতে একখানি শাণিত তরোয়াল মোচন পূর্ব্বক, বীরাঙ্গনা অসি হস্তে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে বহিষ্কৃতা হইলেন। এই সময় সিংহদ্বারে সিংহনাদ সদৃশ চীৎকার হইতে লাগিল। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে কামান ধ্বনিতে ক্ষীরশানগর কম্পান্বিতময় হইয়া উঠিল। নবাব সন্নিধানস্থ

সিপাহী, শাস্ত্রী, প্রহরী সকল সিংহদ্বারাভিমুখে ধাবিত হইলে নবাব সাহেব একক হইয়া, কিংকর্ত্তব্য মনে ইতস্ততঃ করিতে-ছেন। এই সময় শৈলেশ-নন্দিনী, মহিষ-মর্দ্দিনী, সম প্রচণ্ডাবেগে নবাব কুতবদ্দীনের নিকটস্থা হইয়া, অতীব উত্তেজনা সহিত অসিসঞ্চালিত পূর্ব্বক কুতবদ্দিনের মস্তক ভূমিসাৎ করিলেন।

দিল্লীশ্বরের এক সহস্র সৈন্য সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। যুবরাজ বীরধ্বজ সিংহ জল্লাদ হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইয়া আপন সৈন্য সহকারে সিংহ সদৃশ প্রতাপে রণোন্মত্ত হইয়া, কুতবদ্দীন সেনাদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছেন। রণভূমি রুধিরে প্লাবিত হইয়াছে। এই সময় এলাইত কেশী, খড়্গহস্তা, শৈলেশ-নন্দিনী রণভূমে সমুপস্থিতা হইয়া, স্বামী পদতলে কুতবদ্দীনের ছিন্ন মুণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। শৈলেশ-নন্দিনী উচ্চনাদে বলিলেন পতিব্রতা রমণীর পতির অবমাননার প্রতিফল প্রদান করি-য়াছি। দুরাত্মন. যবনাধম কুতবদ্দীনের ছিন্ন মস্তক স্বামীপদে দলিত জন্য উপহার দিলাম, প্রভু গ্রহণ করুন। শৈলেশ-নন্দিনীর অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শনে দ্রষ্টাবর্গে চমৎকৃত এবং বিস্ময়ান্বিত হইল। যুবরাজ বীরধ্বজ সিংহ সস্নেহে, সরল চিত্তে শৈলেশ নন্দিনীর প্রতি বলিলেন,—প্রিয়তমে, প্রাণেশ্বরী, পতিব্রতে! বীর-পত্নীর সমোচিত কার্য্য করিয়াছ। এ জগতে তুমিই ধন্যা, তুমি রমণী কুলোজ্জ্যোতি রত্নময়ী। শৈলেশ-নন্দিনী করস্থিত অসি পরিত্যাগ করিলেন, এবং কটিবন্দন উন্মোচন করিয়া, অবগুণ্ঠনা না হইয়া পতিপদ প্রণীতা হইলেন। স্বপক্ষ সৈন্য মণ্ডলী উচ্চনাদে, জয় দিল্লীশ্বরের জয়, জয় যুবরাজ বীরধ্বজ সিংহের জয়—জয় রাণী শৈলেশ-নন্দিনী মায়ী কি জয়, বলিয়া রণজয় ধ্বনি করিল।

কুতবদ্দীনের জীবিত সৈন্য সমূহ বীরধ্বজ সিংহের আজ্ঞানুসারে বন্দীগ্রস্থ হইল। যুবরাজ কুতবদ্দীনের দুর্গ অধিকার করিলেন। দুর্গস্থ পুরবাসিনীদিগকে শিবিকারোহনা করাইয়া সম্মানিত প্রকটিতে বন্দীগণসহ দিল্লি-নগরিতে বাদসাহ সন্নিহিতে প্রেরিত করিলেন। কেবল কিয়দ্দংশ সৈন্য ক্ষীরশায় রাখিয়া রাজকুমার সস্ত্রীকে দুর্গস্থায়ী হইলেন।

এই বৃত্তান্তর কিছু দিবস পর ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের অধিকার হইলে, কমলকুমারী এবং হেমচন্দ্র জলমগ্ন হইয়াছেন। কন্যা শোকে, নবকুমারবাবুর নিগ্রহ ভয়ে অথলা তারাবতী, কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইলে, তাহারও কোন অনুসন্ধান হইল না। জয়ধর সিংহও কারাবাস হইতে মুক্তিলাভ হইলেন কি না, তাহারও কোনই খোজখপর নাই। নবকুমারবাবুর আক্রোশে বা কুচক্রে পড়ে, বংশটী উচ্ছন্ন প্রায় হইল। সাধের কন্যা স্বর্ণ-প্রতিমা কমলকুমারী জন্মের জন্য বিসর্জ্জন হইলেন। দুর্জ্জনের চিত্তবৃত্তি হরণের জন্য বিধাতাও কি ভগ্নদান হইয়া থাকেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা দর্শন।

কাশীকৈবল্যধাম, আজ মহাষ্টমী, রাত্রি চারি দণ্ড অতীত। অন্নপূর্ণার মন্দিরে সন্ধিপূজার বিষম ব্যাপার। লোকে লোকারণ্যময়, কাহার সাধ্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়িতে দর্শকমণ্ডলীতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইল। কাহারও দর্শন লাভ হইল, কেহ বা নিষ্কলিত হইলেন। সন্ধিপূজার সমাধা হইল বাদ্যভাণ্ড নীরব হইল, দ্রষ্টার্থীকে প্রহরীগণ কর্ত্তৃক শ্রেণীবদ্ধ করা হইল: একটী অৰ্দ্ধা বয়স্কা স্ত্রীলোক মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বৃহৎ স্বর্ণাধারে, অন্নপূর্ণার প্রসাদী পুরী এবং মিষ্টান্ন লইয়া বাহির হইলেন। শ্রেণীভুক্ত দর্শকবৃন্দকে প্রসাদী খাদ্য পরিবেসন করিতে লাগিলেন। সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হইলে, পরিশেষে একটি সম্ভ্রান্তজনক ব্যক্তির হস্তে প্রসাদ দিলেন। কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত হইল। উভয়েই বিস্ময়ান্বিতে

যেন স্মৃতিপটে মননিবেশ করিলেন। সকলে প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল। শেষোক্ত ব্যক্তিও ধীরপদে তাহাই করিলেন। স্ত্রীলোকটিও দেবী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ভক্ষনী কর্ণিকার প্রসাদ এবং জলপান করিয়া সোপানোপরি উপবেশন পূর্ব্বক যেন কতই কি ভাবিতে লাগিলেন; রাত্র দুই প্রহর অতীত হইলে গাত্রোত্থান করিলেন। পুনশ্চ অন্নপূর্ণার মন্দির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী, নীরবে নিস্পন্দে, মুদ্রিত চক্ষে, ধ্যানাসনে উপবিষ্টা। আগন্তুক ধ্যানাবলম্বিনীর ধ্যান-ভঙ্গের উপেক্ষাকৃত হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর, দেবীমন্দিরস্থ সকলেই নিদ্রিত, পৃথিবী নীরবময়, কেবল আগন্তুক পুরুষটি মন্দিরস্থ স্ত্রীলোকটির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। স্ত্রীলোকটীর ধ্যান ভঙ্গ হইল, কিন্তু ধ্যানভঙ্গমাত্রেই চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। মুক্তকেশী আবরণ বিহীন মস্তকে অবগুণ্ঠন পূর্ব্বক, কম্পান্বিতে চঞ্চলিত চিত্তে, আগন্তুকের নিকটাগতা হইয়া, পদে প্রণীতা হইলেন, এবং চরণদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আগন্তুকটি জয়ধরসিংহ; জয়ধরসিংহ সন্তাপিনীর প্রতি বলিলেন, তারাবতী, গৃহিণী, গৃহলক্ষ্মী তুমি এখানে, জয়ধরসিংহ দুই হস্তে! তারাবতীর হস্ত দুইটি আপন পদ হইতে বিচ্ছেদ করিলেন। প্রাণেশ্বর, জীবিতেশ্বর হৃদয় বল্লভ, এই বলিয়া জয়ধরসিংহের উভয় স্কন্ধে উভয় হস্ত দিয়া তারাবতী নতবদনে কাঁদিতে লাগিলেন। জয়ধরসিংহেরও নয়ন দুইটীতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। উভয়েই কিয়ৎ সময় ক্রন্দন করিলেন, ক্রন্দন নিবৃত্তি হইলে উভয়ে ক্ষণেক সময় নীরবে রহিলেন। কমলকুমারী কোথায়, গৃহ পরি-

ত্যাগ বিষয়, তারাবতীর প্রতি জয়ধরসিংহ জিজ্ঞাসিত হইলে, তারাবতী আদ্যপ্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এবং ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, কমলকুমারী, হেমচন্দ্র উভয়ে জল-মগ্ন হইয়াছে, ইহাই জনশ্রুতি হইতেছে। আমি কন্যা শোকে, নবকুমারবাবুর আক্রোশে গৃহত্যাগী হইয়া, নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া কাশীশ্বরের কৃপায় দেবী-অন্নপূর্ণার পরিচারিকা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। এবং করুণাময়ী অন্নপূর্ণার করুণাগুণে আজ পতিপদও লভ্য করিলাম। প্রভু আমি মাত্র ধ্যানে, হৃদাসনে! অন্নপূর্ণা দর্শনে অসীম আনন্দ লাভ করিতেছিলাম। এই সময় অন্নপূর্ণা বলিলেন, তারাবতী তুমি আমা দরশনে মোহিতা হইয়া রহিয়াছ, তোমার স্বামী জয়ধর যে তোমার জন্য উপেক্ষাকৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। প্রভু! দেবীবাক্যেই আমার ধ্যানভঙ্গ হইল। দেবী প্রসাদেই স্বামীচরণ দর্শন লাভ হইল।

জয়ধরসিংহ বলিলেন আমিও তোমার ত্রি মঙ্গলময় বাচ্য যোজনা করি, কাশীনাথ, এবং দেবী অন্নপূর্ণা তোমার মনস্কামনা পুর্ণ করুন। তারাবতী পতিপদে পুনর্ব্বার একটী প্রণাম করিয়া রাজদণ্ড হইতে পরিত্রাণ বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, জয়ধরসিংহ বিস্তৃতরূপে বলিতে লাগিলেন। আমি কারাবাস হইতে মুক্তি পাইয়া বীরেশ্বর পুরগ্রামে আমাদের বাটীতে যাইয়া তোমায় দেখিতে পাইলাম না। গ্রামস্থ কোন কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল তাঁহারা দেশত্যাগী হইয়া কোথা যে গিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। সংসার শূন্যময় বোধ হইল। ভাবিলাম ধন, যৌবন, পুত্রকন্যা, বৈভব, সুখাদি যাহা কিছু সকলই অলিক্যতা মাত্র। সত্য ধর্ম্মই সার পদার্থ জানিয়া বীরেশ্বরপুর

হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। মনে করিলাম আর লোকালয়ে থাকিব না, যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকেই যাইব। যে কয় দিবস বাঁচিয়া থাকিব, তীর্থে তীর্থে, অরণ্যে অরণ্যে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে পরিভ্রমণ করিয়াই মানবলীলা। পরিশেষ করিব। ঐ প্রতীতিতে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকাভিমুখে সুযাত্রা করিলাম দিবা বিভাগে অবিশ্রান্তে গমন করিয়া, সূর্য্য অস্তমিতকালে যথায় তথায় অবস্থিতি হইয়া রাত্র পরিশেষ করিতাম। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইলে লোকালয় পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। এক দিবস সন্ধ্যা সমাগমে এক ভয়ঙ্কর মহারণ্যে উপস্থিত হইলাম। ক্রমে যতই রাত্র বেশী ততই আশঙ্কার বৃদ্ধি। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির ভয়ঙ্কর রবে, সিংহের গর্জ্জনে, জীবন আশা নিষ্ফল হইল। বীজনারণ্যের মধ্যভাগে পতিত হইয়াছি আর পরিত্রাণের উপায় নাই। কোথায় আসিলাম, কি করিলাম, জন্মের জন্য কমলকুমারীকে দেখিবার সাধ ফুরাইয়া গেল। সাধ্বী সতী পতিব্রতা পত্নী তারাবতীর গতি কি করিলাম, কোথায় হারাইলাম, একবার মৃত্যু সময় দেখিতে পাইলাম না। ঐ প্রকার সন্তাপে চিত্ত ত্রাসিত হইতে লাগিল, আবার সিংহের ভীষণ গর্জ্জন কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে আতঙ্কে জ্ঞান রহিত হইল, চক্ষু মুদিত হইল, ভূতলে পতিত হইবার উপক্রম। এই সময় একটি জ্যোতির্ম্ময় তেজস্বী, তাপসী মহাকায় মহাপুরুষ নিকটাগত হইয়া জয়ধরসিংহ ভীত হইয়াছ? ভয় কি, এই বলিয়া আমায় ধারণ করিলেন। ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের অঙ্গস্পর্শ মাত্রেই আমার সংজ্ঞালাভ এবং শরীরস্থ দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইল। চক্ষু মিলিয়া দেখিলাম, মস্তকে লম্বিত জটারাশি বিস্তৃত, অঙ্গখানিও লম্বিত গৌরাঙ্গময়, গলদেশে রুদ্রাক্ষ,

পরিধান এবং উত্তরীয় রক্তাম্বরে সুশোভিত, শুভ্র শ্মশ্রুরাশী, দক্ষিণ করে জপমালা।

জিতেন্দ্রের চরণ বন্দনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিত হই-লাম প্রভো ঘোর বিপন্ন সময় অকৃতজ্ঞকে যদি চরণ দর্শন এবং জীবন দান দিলেন, তবে নিজ পরিচয় দানে আমায় কৃতার্থ করিতে হইবে। শান্তমতি আমার প্রশ্নে দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিলেন, আমি তীর্থবাসী তাপসী মাত্র, যথায় তথায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকি, নাম বোপদেব শাস্ত্রী।

অতীব বিনয়ান্বিতে বলিলাম আমি আপনার সেবক এ দাসকে দীক্ষা দান দিয়া তীর্থ দর্শন করাইতে হইবে। শাস্ত্রী জীউ আমার গুরু হইলেন, মন্ত্রদান দিয়া অনেকানেক তীর্থ দর্শন করাইলেন। একদিবস বলিলেন, তোমার সুখের সময় হইয়াছে, অতুলনীয় বৈভবশালী হইবে, সেই সময় কোন কারণ বশতঃ সাক্ষাৎ দিব, আমি এক্ষণে হিমাদ্রী পর্ব্বতে তপস্যায় যাইব, বদরিকাশ্রমে এই কথা বলিয়া আমায় বিদায় দিয়া, গুরুদেব শুভাগমন করিলেন।

তারাবতী বলিলেন গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয় তাহা হইলে চলুন, ইতিমধ্যে বিদায় হইয়া আমরা বীরেশ্বর পুরে যাই। কি সুখেই বা বীরেশ্বরপুরে যাইব, কি সুখেই বা আবার সংসারী হইব, সংসা-রের সার, প্রাণের প্রফুল্লক, হৃদয় সুসজ্জিত পুত্ররত্ন হইতে জগদীশ্বর বঞ্চিত করিয়াছেন। নিষ্ফলিত বৃক্ষে মাত্র কুসুম সদৃশ যদিও একটি সন্ততীলাভ হইয়াছিল, তাহাতেও নৈরাশ্য হইলাম। হৃদয়ের অধিষ্ঠিত কুসুমসমা কমলকুমারী হৃদয় শূন্য করিয়া নীমিলিত হইল? গভীর শোক সিন্ধুসম সংসারার্ণবে কেমন করিয়া অবস্থিতি হইব। এই বলিয়া জয়ধরসিংহ অধোবদনে

নয়নাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তারাবতী বলিলেন সুখ, দুঃখ, শোক-আনন্দ ঈশ্বরের নিয়মাবলি, তাহা বলিয়াই অপত্য শোকে অভিভূত হইয়া পরমধর্ম্ম সংসার ক্রিয়ায় বিরত হওয়া আপনার ন্যায় বিশিষ্টতার পক্ষে অবিধায়।

বিশেষতঃ গুরুদেব শাস্ত্রী জীউর অনুমতি হইয়াছে। গুরুবাক্য উলঙ্ঘনে ভয়ঙ্কর পাপের আশ্রয় হইয়া, পরিণামে ঘোরনরক ভোগী হইতে হয়।

জয়ধরসিংহ বলিলেন, গুরুবাক্য অবহেলনে প্রাণিকে নরক যাতনা আর প্রতিপালনায় ঐহিকে শোকাগ্নিতে দগ্ধিভূত, তবে তুমি কোন পথটী অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর। তারাবতী বলিলেন, দেব! বিচলিত হইবেন না, চিত্তকে সুস্থির করুন, মোহলতা বিচ্ছিন্নপূর্ব্বক সংসার ব্রতে ব্রতী হউন। দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় গুরুদেব বোপদেব শাস্ত্রীর ইচ্ছায়, সর্ব্বত্রিক মঙ্গলজনক হইবে।

সাধ্বী স্ত্রী, তারাবতীর হিতবাক্যে জয়ধরসিংহ সংসারাশ্রয় গ্রহণে সম্মতি প্রদান করিলেন। কয়েক দিবস কাশীধামে অবস্থিতি হইয়া, সস্ত্রীকে অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে বিদায় হইয়া বীরেশ্বর পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

——:০:——

ক্ষীরশাগ্রাম এখন ক্ষীরশা রাজধানী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। শৈলেশ নন্দিনী কর্ত্তৃক নবাব কুতবদ্দীনের মস্তক ছিন্নতা শ্রবণে দিল্লীশ্বর অতীব বিস্ময়ান্বিতে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। পাঠান দলন কর্ত্তৃক পুরস্কার স্বরূপ শৈলেশ নন্দিনীকে ক্ষীরশা রাজধানী প্রতিদান করিয়াছিলেন। কুতবদ্দীনের পুরবাসিনীদের আদৃতের সহিত অতীব যত্নসতকারে বাদসাহ নিজ সমষ্টিগম অন্তপুরস্থাদিগের সহবর্ত্তিনী করিয়া রাখিয়া ছিলেন। কুতবদ্দীনের কন্যা সময়ে সময়ে ক্ষীরশয়ে আসিয়া শৈলেশ নন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ লাভে আমোদিতা হইতেন। ক্ষীরশার রাজমহিষী শৈলেশনন্দিনীও নবাব পুত্রীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া যত্ন করিতেন। ভারতবর্ষ ইংরাজ রাজের অধিকৃত হইলে, মহারাজ বীরধ্বজ সিংহ বাদশাহের স্বাক্ষরিত ছার দেখাইয়া কথঞ্চিৎ কর প্রদানে বাধিত হইয়াছিলেন। ক্ষীরশা রাজধানি এখন একটি

প্রধান সহর সুসজ্জিতময়। মহাজনপটী, সওদাগরপটী, সোণা-পটী, জহরপট্টী, দোকানী, পসারি ইত্যাদিতে, এবং রাজভবন, রাজকাছারী রাজোত্থান, রাজপথ সকল সুরম্য সুদৃশ্যময়। এক দিবস রাত্রি ছুই প্রহর সময় মহারাজ বীরধ্বজ সিংহ রাজকার্য্যে অবসর লইয়া আপন বিলাস কক্ষে স্বর্ণপালঙ্কোপরি উপবেশনে, রাণী শৈলেশ-নন্দিনীর সহমিলনে, প্রমোদিত। এই সময় বাদসাহ দিল্লীশ্বরের কথা স্মৃতিগম্য হইলে, মহারাজ পরিশোচনা যুক্তে বলিলেন, অহো কালের কি বিচিত্র নিয়ম। আকবর-সাহেব সেই গম্ভীরময় প্রতাপ, প্রভাব, প্রকাণ্ড কাণ্ড, অদ্ভুত বীর্য্যবন্ত সম্রাটললনা জলবিম্বের ন্যায় চকিত মাত্রেই নীমিলিত হইয়া গেল। দিল্লীশ্বরের সেই সুখসম্পত্য, সুখমাপন্ন সৌন্দর্য্য-ময় দেহখানি মৃণ্ময়সাৎ হইয়া সমোজ্জ্বল রাজধানী তিমিরময় হইল। শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, প্রকৃতির স্বভাবই ঐরূপ উহাতে আর বিচিত্র কি। বিধাতার লিপি উলঙ্ঘন করিতে কাহারই সাধ্য নাই। অগাধ জলধি শুষ্ক হইয়া দীপ স্থল হইতেছে। কোথাও মহানগর পরিধ্বংস হইয়া জলাকারে স্রোতময় হই-তেছে। নিশাস্বপ্নবৎ রাজৈশ্বর্য্য আর ক্ষণভঙ্গুর দেহের গরিমা কি?

বীরধ্বজ সিংহ বলিলেন, জগতীতলে কি কাহার অহঙ্কার নাই?

শৈল। অহঙ্কার, অব্যয় এবং নিত্যময় সত্য বলিতে কেবল ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতত্ত্বাবলম্বী ভিন্ন আর কেহই নাই।

বীর। তাহা হইলে ধর্ম্মই মুল বস্তু, ধর্ম্ম কাহাকে বলা যায়?

শৈল। ঈষৎহাস্যে বলিলেন ও আবার কি, তারাদেবীর নিকট

বৃহস্পতির জ্ঞান শিক্ষা। না না না বুঝেছি, ওটা আমার নিকট পরীক্ষা লওয়া। তাহাতেই বা পরাঙ্মুখ হইব কেন। অহিংসা সদাচার পরোপকার দেব দেবীর ঐকান্তিকতায় ভক্তিশ্রদ্ধা, এই সুনিয়ম সকল পুরুষ জনার পরম ধর্ম্ম। স্ত্রীজাতির পক্ষে, পতিব্রতা ব্রতধর্ম্মাবলম্বিনী রমণীরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। শৈলেশ নন্দিনীর শাস্ত্র সঙ্গত বাক্যে হৃষ্টচিত্তে ঈষৎহাস্যে যুবরাজ বলিলেন, রমণীর পতিব্রতাধর্ম্ম সত্য জানিয়া, তবে রণরঙ্গিনী বেশে রণোন্মত্তা হইয়া কুতবদ্দীনের মস্তক ছেদনে জীবহন্তা পাপের ভাগী হইলে কেন? ক্ষীরশার রাজমহিষী পদ্মোৎফুল্ল সদৃশা হাস্যবদনে বলিলেন, তাহাই যদি না করিলাম, তবে পতিব্রতাধর্ম্ম আর কাহাকে বলিয়া থাকে। স্বামী শত্রু নিগ্রহে দুর্দ্দশাগ্রস্থ রহিলেন, আর স্ত্রী গৃহাবস্থিতে স্বামী চিন্তা, স্বামীর জন্য ব্যাকুলিতা হইলেই কি পতিব্রতাধর্ম্মের সুপদ্ধতি পালনা হইয়া থাকে। তাহা হইলে সাবিত্রী দেবী সত্যবান সহিতে কাননে না যাইয়া গৃহেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। আমি সতীত্ব তেজেই শৈলেশ্বরীকে উজ্জাপনা করিয়া, দেবী অর্চ্চনা, দেবী বন্দনা, সাধনাদির দ্বারায় শত্রু নিগ্রহের বর প্রাপ্ত হইয়াছি সতীত্ব তেজেই শত্রু গৃহে সমাগতা হইয়া, আমার জীবিতেশ্বরের জীবনরক্ষা করিয়াছিল সতীত্ব তেজেই যবন কুতবদ্দীনের মস্তক ছিন্ন করিয়া ক্ষীরশার রাজমহিষী হইয়াছি। জীবনসত্বে পতিপদ জোরে দুষ্টের দমন-সৃষ্টের পালন করিতে কুণ্ঠিতা হইব না।

যুবরাজ বলিলেন তুমি কুতবদ্দীনের দুর্গে আমার চিকিৎসা সময় মধ্যে মধ্যে কোথায় যাইতে।

শৈলেশ নন্দিনী বলিলেন, আপনার শিবিরে যাইয়া দিল্লীশ্ব-

য়ের নিকট দূত পাঠাইয়া সৈন্য আনিয়াছিলাম, আপনার বিচা-
য়ের দিবস যবন পিশাচ আপনার প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিলে,
ছাদে আরোহণ করিয়া সাঙ্কেতিক নিশান দেখাইলে, আমাদের
সৈন্য-মণ্ডলী সিংহ-দ্বারে সমুপস্থিত হইয়া কামান দাগিতে
লাগিল। এই প্রস্তাবনার পর কৃতবন্দীনের মস্তক ছেদন বিষয়
বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিলে, প্রশংসিত জনক বাক্যে রাজকুমার
বলিলেন, রাজ্ঞি! বীরকুল উজ্জ্বলিত জন্যই তুমি রাজপুত বংশে
জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এবং বীর পত্নী হইয়াও অলৌকিক কার্য্য
সম্পাদনে আমায় চিরবাধিত করিয়াছ। আর একটী কথা, দেবী
শৈলেশ্বরীর মন্দিরে প্রথম কিরূপে সমুপস্থিত হইয়াছিলে?

শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, আপনার জন্য মনোচাটিত হইলে
রাত্র-বিভাগেই পিত্রালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া শৈলেশ্বরী-স্থিতা
বনবিভাগে উপস্থিত হইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে পার্শ্বভাগে
ভগবতী শৈলেশ্বরী দর্শনলাভ হইল। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ
এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণীতা হইয়া প্রত্যাগমন করিতে পূজারী ঠাকুর
বলিলেন, মা! নিশা-বিভাগে কোথায় গমন করিবেন, শৈলে-
শ্বরীর অর্চ্চনা করিয়া সুযাত্রা করুন, দেবী নিরাপদে মনস্কামনা
পূর্ণ করিবেন। এই বলিয়া পূজারী-ঠাকুর মন্দির হইতে
নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজাবাসে গমন করিলেন। ইহার পর দেবী
মন্দিরস্থ ঘটনা বিষয় শৈলেশ-নন্দিনী স্বামী সন্নিধানে বর্ণনা করিলে
রাজকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

শৈলেশ্বরী মন্দির সন্নিধ্য এখন সেইরূপ জঙ্গলাকীর্ণ নাই।
এখন আর ডাকাতের পূজা নাই। রাণী শৈলেশ-নন্দিনীর
অর্থব্যয়ে প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। চারি

সীমায় অর্দ্ধক্রোশ পরিসর প্রাচীর গ্রথিত হইয়াছে। দেবীর সেবার জন্য অপরিসীমা জমি দেবত্তর করিয়া উপদেশক পূজারী ঠাকুরের উপর সেবার ভারার্পণ হইয়াছে। প্রহরী সেবিকা মাল্যকর সকলই নূতন বন্দোবস্ত। রাণী শৈলেশ-নন্দিনী এখন প্রাতে এবং সন্ধ্যায়, এই দুই সময় নৈতিক দেবী দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

যামিনীযোগে বিলাসভবনে শৈলেশ্বরী-দত্তা বীণাযন্ত্রটী শৈলেশ-নন্দিনী স্বামী সন্নিহিত প্রত্যহই বাদ্য করিয়া থাকেন। অদ্য শৈলেশ-নন্দিনী কর্ত্তৃক বীণা নিনাদে যুবরাজ নিদ্রিত হইলেন।

এক দিবস রাজকুমার শৈলেশ-নন্দিনীর প্রতি জিজ্ঞাসিত হইলেন, রাজ্ঞি! সুররঞ্জিত সুমধুর স্বর মিশ্রিত বীণাযন্ত্রটী কিরূপে কোথায় প্রাপ্ত হইয়া, ইহার ঝঙ্কারে দেবী শৈলেশ্বরীকে পরিতুষ্ট করিয়াছ? শৈলেশ নন্দিনী বলিলেন, আমি পুরোহিত ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের একটী রমণী শৈলেশ্বরীর অর্চ্চনায় আসিয়া এই বীণা বাদনে প্রত্যহ দেবীর স্তুতি পাঠ করিতেন। তাঁহার আশা নিবর্ত্তাবধি, বীণাযন্ত্রটী দেবী হস্তেতেই বিরাজিত, আমিও তাহাই দেখিয়াছি। প্রথম নিশাতেই আমা কর্ত্তৃক দেবীপূজা সমাধা হইলে, দেবীর স্তবারম্ভ সময়, দেবী যেন আমায় বলিলেন, শৈলেশ-নন্দিনী! তোমার পিতৃবংশীয় কন্যার হস্তস্থিত বীণাযন্ত্র তোমারই জন্য এ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছি, ইহা বাজাইয়া আমায় পরিতৃপ্ত কর। দেবীর প্রত্যাদেশ ক্রমে শৈলেশ্বরীর হস্তস্থিত এই বীণাযন্ত্র লইয়া আমি সুরনিঃসরণ করিলে ভগবতী আমার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন।

রাজকুমার বলিলেন, পূর্ব্বে কাহারদ্বারায় শৈলেশ্বরী স্থাপনী

হইয়াছিলেন, তাহা কি জ্ঞাত হইয়াছ? রাজমহিষী বলিলেন, পূর্ব্বে পুরোহিত ঠাকুর তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন, তাহাই আমাকে বলিয়াছিলেন, আমার পিতার কোন পূর্ব্ব-পুরুষ কর্ত্তৃক শৈলেশ্বরী স্থাপিতা হন। আমার পিতা নিঃসন্তানি থাকায়, মাতা সন্তান কামনায় প্রতিদিন প্রাতে এবং সন্ধ্যায় শৈলেশ্বরীর অর্চ্চনায় আসিতেন, শৈলেশ্বরীর প্রভাবেই আমার জন্মগ্রহণ। সেইজন্য শৈলেশ নন্দিনী বলিয়া মাতা আমার নাম রাখিয়াছিলেন। জননীর দ্বিতীয় গর্ভসঞ্চারে আমার ভ্রাতা জয়ধর সিংহ জন্মগ্রহণ করে। মাতার সন্তান সন্ততির মধ্যে আমরা ভাই ভগিনী। এই বলিতেই শৈলেশ-নন্দিনীর বিশালিত নয়ন যুগল হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত হইতে লাগিল।

রাজকুমার বিস্ময়ান্বিতে অকস্মাৎ শোচনীয় বিষয় মহিষীর নিকট জিজ্ঞাসিত হইলে শৈলেশ-নন্দিনী দীর্ঘ নিশ্বাস নিক্ষিপ্ত করিয়া নবকুমারবাবুর অত্যাচার ঘটিত পিতৃবংশীয় জয়ধর সিংহ, তারাবতী, কমলকুমারীর বিপন্ন বিষয় স্বামী সন্নিহিতে অবগত করিলেন। রাজকুমার বলিলেন, হেমচন্দ্র এবং কমলকুমারীর সেই হইতে কোনই সংবাদ পাওয়া যাইল না। শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন সংবাদ পাইবার আশা বিফল হইয়াছে। জনরবে শোনা যায় নব প্রেমানুরাগে নিরাশা হইয়া দুইটীতেই জলমগ্ন হইয়াছে রাজকুমার পরিতাপে ক্রোধাক্তচিত্তে বলিলেন, মহিষি! দুরাত্মন নবকুমারের অসৎ ক্রিয়াসকল তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াও তাহার তদুপযুক্ত শাসনায় ক্ষান্ত হইয়াছ কেন, এবং ঐরূপ বিপরিত ক্রিয়ার বার্ত্তা আমার কর্ণগোচর কর নাই, ইহারই কারণ কি?

শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, আমি শৈলেশ্বরীর অর্চ্চন দর্শন সময়ে সন্ধ্যাকালীন বীরেশ্বরপুরের প্রান্তভাগে বনস্থলিতে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। উভয়ের প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে জানিতে পারিতাম, উভয়ের করস্থ রেখা দৃষ্টে জানিয়াছিলাম এই পবিত্র পরিণয় সমাধান ভিন্ন কিছুতেই ভঙ্গ হইবে না। তাহাতেই সন্তোষিত হইয়া ভাবিয়াছিলাম, বিধির লিখন অখণ্ডনীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অব্যর্থ তাহাতেই নবকুমার বাবুর প্রতি কোনরূপ পীড়নাদি না করিয়া, এবং আপনার কর্ণস্থ না করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু দুরাদৃষ্ট ক্রমে বিপরিত হইবে বলিয়া স্বপ্নেও জানিনে।

মহারাজ বীরধ্বজ সিংহের চক্ষুদ্বয় ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইল। নবকুমার বাবুর বংশ উচ্ছন্ন করিব, এই অভিপ্রায়ে হুজুরের হাজির হইবার জন্য একখানি লিপিকা দ্বারায় নবকুমার বাবুর নিকটে বীরেশ্বরপুরে একটী লিপিবাহক প্রেরণ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

দেবীদর্শনে সম্মীলন।

——•——

সন্ধ্যাদেবীর সমাগম, দেবী-শৈলেশশ্বরীর মন্দিরে দীপালকে সমোজ্জ্বল শোভাসম্পাদিত হইয়াছে। ঢাক-ঢোল কাঁশর ঘাড়, শঙ্খ ঘণ্টার বাদ্যে একের কথা অন্যের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ হওয়া দুঃসাধ্যপ্রায়। ধূপ ধুনার ধূপরাশীতে দেবালয় সমাচ্ছন্ন। সৌগন্ধে আমোদিত। শৈলেশশ্বরীর আরতি উৎসবদর্শনে লোকারণ্যময়। ঠেলাঠেলি, হুড়াপাড়ীতে ব্যতিব্যস্তময়, আরতি সমাধান হইল, বাদ্যরব নিঃশব্দ হইল, দেবী দর্শনাগতগণ আরতীর প্রসাদ লইয়া বিদায় হইল। দেবীমন্দিরের বহির্দ্দেশে একখানি শিবিকা উপস্থিত হইল। শিবিকাভ্যন্তর হইতে একটী অর্দ্ধ বয়স্কা রমণী বহির্গতা হইলেন। রক্তবস্ত্র পরিধানা, দক্ষিণহস্তে পুষ্পপূর্ণিত স্বর্ণময় পুষ্পাধার। দাস, দাসী, আরদালী ইত্যাদি ভৃত্যবর্গ সহন্বিতা। রমণীটী কোন সম্ভ্রান্ত গৃহের কর্ত্তৃ বলিয়াই অনুভূত হইল। শিবিকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দেবীপূজা উদ্দেশে ধীরপদে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলে, দ্বারপাল কর্ত্তৃক

নিষেধিত হইলেন। আমি দেবী-শৈলেশশ্বরীর অর্চ্চনা মানসে আসিয়াছি, ইহাতে প্রতিবন্ধকতার কারণ কি, অস্ফুট সুধাস্বরে দ্বাররক্ষকের প্রতি এই কথাটী জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রহরী বলিল আমাদের মহারাণীর পূজা না হইলে অগ্রে অন্য কর্ত্তৃক পূজা হইবে না, মহারাণীর এইরূপ হুকুম আছে।

দ্বারবানের বাক্যে রমণী অপ্রস্তুতে তিষ্ঠলাভ জন্য ইতস্ততা হইলেন। এই সময় অদূরবর্ত্তীতে হুমহাম হুমহামরব কর্ণগোচর হইয়া অনুচর বর্গ সহিত একটি শিবিকার নিকটস্থ হইল। বাহকগণ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে মন্দির বহির্ভাগে শিবিকা সংস্থাপন করিলে অতসীকুসুমবর্ণা একটি রমণী বহির্গতা হইলেন। রমণীটি শৈলেশ-নন্দিনী। শৈলেশ-নন্দিনী পূর্ব্বাগতা অবগুণ্ঠনা রমণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, প্রহরীর প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ভদ্র মহিলাটি বোধ হয় দেবীদর্শনে আসিয়াছেন, তবে বহির্ভাগে অবস্থিতা কেন। প্রহরী উপেক্ষাকৃত রমণীর বিষয় মহারাণীর নিকট বর্ণনা করিলে, শৈলেশ-নন্দিনী আগ্রহান্বিতে অবগুণ্ঠনাবতীর নিকটস্থা হইয়া অতীব মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় হইতে আসিয়াছেন? রমণী অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন আমি বীরেশ্বরের নগর হইতে দেবী অর্চ্চনায় আসিয়াছি। শৈলেশ-নন্দিনী সবিস্ময়ে, আশ্চর্য্যান্বিতে, রমণীর স্কন্ধদ্বয়ে দুইটি করপল্লব সংস্থাপনা করিয়া বলিলেন, তুমিই কি আমার হারাধন ভ্রাতৃবধূ, তুমিই কি আমার প্রাণ-প্রতিমা কমলকুমারীর গর্ভধারিণী, তুমিই আমার ভ্রাতৃবংশের গৃহলক্ষ্মী তারাবতী? শৈলেশ-নন্দিনীর অংশযুগলে যুগলকর সংশোভিত পূর্ব্বক ক্রন্দনযুক্তে, তারাবতী বলিলেন, আমিই হতভাগিনী তারাবতী, আপনিই কি আমার

ননন্দা শৈলেশ নন্দিনী? মহারাণী ক্রন্দনস্বরে বলিলেন, আমি তোমাদের দুঃখিনী শৈলেশনন্দিনী। হর্ষে, উল্লাসিতে, উৎকণ্ঠিত বিপর্য্যতা স্মরণে, উভয়েই কিয়ৎসময় রোদন করিলেন; এবং উভয়কেই উভয়ে সান্ত্বনা করিলেন। শৈলেশ-নন্দিনী, তারাবতীর করধারণ পূর্ব্বক শৈলেশ্বরীর মন্দিরাভ্যন্তরে সমাগত হইয়া দেবী বন্দনান্তে উভয়ে উপবেশন করিলেন।

তারাবতীর প্রতি শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, বউ! কমল-কুমারীর নিরুদ্দেশ হইলে দুরাত্মন নবকুমারের আতঙ্কে তুমি পলাইত হইয়া কোথায় অবস্থিতি হইয়াছিলে? তারাবতী বলিলেন, ঠাকুরকন্যা! সেই কষ্টের কথা মনে হইলে এ পর্য্যন্তও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আতঙ্কে শরীর কম্পিত এবং কণ্টকময় হয়, প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কত দেশে দেশে বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বিবিধ কষ্টের পর কাশীধামে উপস্থিত হইলে, কাশীশ্বরীর কৃপায়, দেবী অন্নপূর্ণার সেবিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম। শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন তাহার পর বীরেশ্বরপুরে কিরূপে প্রত্যাগতা হইয়াছ? তারাবতী বলি-লেন, তোমার ভ্রাতার সহিত অন্নপূর্ণা পুরীতে সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে বীরেশ্বরপুরে আসিয়াছিলাম। শৈলেশ-নন্দিনী কৌতূহলা ক্রান্তায় বলিলেন প্রাণাধিক ভাই জয়ধর কি আমার কারামুক্ত হইয়া গৃহে আসিয়াছে? তারাবতী বলিলেন, জগদম্বার কৃপায় তিনি পরিমুক্ত হইয়াছেন। আর ধর্ম্ম-বিদ্রোহিদুর্ম্মতি নবকুমার বাবুও সর্ব্বসান্ত হইয়াছে। প্রজাগণের প্রতি উৎকট নিগ্রহতা-চরণ, ব্রহ্মত্তর, দেবত্তর অপহরণ পাপে, লাট মন্দির টাকা অভাবে সমস্ত জমিদারী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তোমার ভ্রাতাই নিলাম

ডাকে জমীদারী সকল খরিদ করিয়াছেন। জালিয়াতী মোকদ্দমায় ধরা পড়িয়া নককুমারবাবু নিরুদ্দেশে পলাইত হইয়াছে; উহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী হইয়া, সরকার বাহাদুরের অনুচর সকল নবকুমারের অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছে। গুরুদেব প্রভু বোপদেব শাস্ত্রী আমাদের আলয়ে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সানুগ্রহে অনুমোদন, নবকুমারের পত্নী চাঁপাবতীকে তোমার ভ্রাতা বহিষ্কৃত না করিয়া উহাদের বাটীতেই রাখিয়াছেন। চাঁপাবতীর ভরণ-পোষণ জন্য মাসিক দশটাকা দাতব্য করিয়াছেন।

জয়ধরসিংহ জমীদারী করিয়াছেন শুনিয়া, শৈলেশ-নন্দিনী যারপর নাই আনন্দিতা হইলেন। তারাবতী এবং শৈলেশনন্দিনী উভয়ে শৈলেশ্বরীর পূজাসমাপন করিলেন। উভয়ে উভয় শিবিকার আরোহনা হইয়া, ভ্রাতা জয়ধরসিংহকে দেখিবার জন্য তারাবতীর সহিত শৈলেশ-নন্দিনী আপন অনুচর বর্গ সহিত বীরেশ্বর নগরে শুভাগমন করিলেন।

বীরেশ্বরপুরস্থ প্রজাবর্গ এখন আর শীর্ণ, জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন প্রায় দুরাবস্থা গ্রস্ত নাই। সকলেই নির্ভীত, উৎসাহিত, আনন্দিতচিত্তে দিন অতিবাহিত করিতেছে। জয়ধর সিংহের বাসগৃহ এইবার আর সেকেলে তেকেলে জীর্ণ, মলীন, ভগ্নপ্রায় নাই। প্রকাণ্ডময় সুন্দর, মনোহর, সুদৃশ্য নূতনপুরী-সুগঠিত হইয়াছে। কাছারী বাটী, অতিথিশালা ঘোটকশালা, হস্তীশালা সকল শ্রেণীভুক্তে সুশোভিত হইতেছে। প্রাসাদাভ্যন্তরে, প্রতিকক্ষ, মণিময় ঝাড়, লণ্ঠনাদী দীপক সকল অসীম সৌন্দর্য্যময় হইতেছে হীরক খচিত বিচিত্রময় চিত্র সকলে অতুলনীয় শোভা সম্পাদন

হইতেছে। নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, আকমান্ত, মণি সকল স্তূপাকারে দোদুল্যমানে জ্যোতির্ম্ময়ে মনোরম্য করিতেছে। দৌবারিক, পদাতিক, সিপাহী, শাস্ত্রী আদি অনুচরবর্গের সিংহদ্বার আতঙ্কিত প্রায়।

জমিদারী কার্য্যে অবসর লইয়া জয়ধর বাবু অন্তঃপুরমধ্যে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। এই সময় একটী দাসী আসিয়া বলিল, মাতাঠাকুরাণী শৈলেশ্বরী দর্শন করিয়া আসিলেন, তাঁহার সহিত আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শৈলেশ-নন্দিনী আসিয়াছেন। মরুভূমিতে শস্যোৎপাদন, অনাবৃষ্টি দেশে বারিবর্ষণে ভূম্যাধিকারী যেরূপ আনন্দিত, জয়ধর সিংহ ততোধিক আনন্দিত এবং উৎকণ্ঠিত চিত্তে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এই সময় তারাবতী এবং শৈলেশ-নন্দিনী, এই উভয়ে জয়ধর বাবুর সম্মুখস্থা হইলেন। জয়ধরবাবু শৈলেশ-নন্দিনীকে অবলোকনপূর্ব্বক বাষ্পাকুলনেত্রে বলিলেন, আপনিই কি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আপনিই কি আমার দিদিমণি, আপনিই কি জননীর স্নেহময়ী কন্যা আদরিণী শৈলেশ-নন্দিনী। তোমার হতভাগ্য ভ্রাতাকে এতদিনে মনে পড়িয়াছে দিদি এই বলিয়া জয়ধর সিংহ শৈলেশ-নন্দিনীর চরণে প্রণত হইয়া পদে মস্তক ধারণ করতঃ ক্রন্দন করিলে, শৈলেশ-নন্দিনী উভয় করে করধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া, ভ্রাতার শিরোচুম্বন এবং উভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎসময় অতিবাহিত হইলে শান্তচিত্তে জয়ধরবাবু আপন কারাবাস হইতে মুক্ত এবং রাজ্য প্রাপ্ত বিষয়, শৈলেশ-নন্দিনীর নিকট বর্ণনা করিলেন। এবং শৈলেশ নন্দিনী বীরেশ্বরপুর হইতে নিষ্ক্রান্তাবধি ক্ষীরশার রাজমহিষী পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত আপন ভ্রাতা

জয়ধর সিংহের নিকট বর্ণিত করিলেন। এবং সেই যামিনীতেই জয়ধর সিংহের এবং তারাবতীর নিকট বিদায় লইয়া ক্ষীরশানগরাভিমুখে গমন করিলেন। শৈলেশ-নন্দিনী ক্ষীরসায় অবতীর্ণ হইয়া আপন স্বামী যুবরাজ বীরধ্বজ সিংহের প্রতি শৈলেশ্বরীর মন্দিরে তারাবতীসহ সম্মীলন, বীরেশ্বরপুরে গমন, জয়ধর সিংহের কারামোচন, এবং জমিদারী প্রভৃতি অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যের প্রকরণ নবকুমারবাবুর সর্ব্বস্বান্ত এবং পলাইত বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। বীরধ্বজ সিংহ জয়ধর বাবুর সুখসৌজন্যতা শ্রবণে আনন্দিত হইলেন। এবং আপনার প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে বীরেশ্বরপুরে পাঠাইয়া অতীব সমাদর সহিত জয়ধর সিংহ এবং তারাবতীকে নিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষীরসা রাজপুরীতে আনিত পূর্ব্বক কয়েক দিনাবধি আনন্দ মহোৎসব করিলেন। এবং জয়ধর সিংহের বিনীত, আগ্রহযুক্ত আবাহনে সন্তুষ্টচিত্তে, শৈলেশ-নন্দিনী সম্মীলিত ক্ষীরসাপতি অতীব সমারোহ সহিতে বীরেশ্বরপুরে গমন এবং কতিপয় দিবসাবধি অবস্থিত পূর্ব্বক ক্ষীরসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:*:——

পরিস্থান বা প্রমোদ মন্দির।

——o——

এ আবার কি মজা, কি অসদৃসদৃশ্য, নির্জ্জন প্রদেশে, নদীর ধারে, বনের মাঝে মনোহর সুদৃশ্য। কি মাধুর্য্য, ফুলের গাছে ফুল ফোটার মত ঐ দুইটি কি ফুলের স্তবক, না ফুলের রাশি, না নির্জ্জন ভূতলে দুইটী চাঁদ নেবেচে। না, না, চাঁদ হবে কেন, চাঁদের বর্ণতো ফিক্‌ফিকে সাদারং এযে দুধে অলক্তে মিশ্রিত গোপাল কুসুম্। কি আশ্চর্য্য চাঁদও নয়, ফুলও নয়; ঐ যে চঞ্চলাসম অঙ্গসঞ্চালনে, স্বর্ণলতিকাসম কর প্রসারণে, একটী অন্যটির প্রতি কি যেন দেখাইতেছে। উভয়টিরই মস্তকন্যস্ত শিথিল কেশরাশি পৃষ্ঠে, কটিতে, উরুতে, বিস্তৃত হইয়া, মলয়া-নীলস্পর্শে, যেন স্বর্ণ পর্ব্বতাঙ্গে সাপিনীদলে স্বভাবত অঙ্ক বক্র হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। হীরক খচিত পুষ্পহারদ্বারায় শিরোবন্ধন এবং পঙ্কজাননে হাস্য প্রকটনে কি মনরম্য শোভাই সম্পাদিত হইতেছে। এইবার স্পষ্টই বোধগম্য হইল ঐ যুগল

মূর্ত্তি সুন্দরী রমণী। কিন্তু মর্ত্তভূমে ওরূপ রমণীয় মূর্ত্তি, রমণীদ্বয় মানবী পক্ষে অসম্ভাবিত। দুইটির মধ্যে একটি অন্যটির প্রতি করপল্লব প্রসারিত করিয়া বলিল, মুরলে! দ্যাখ্ দ্যাখ্ একবার চেয়ে দ্যাখ। মুরলে বলিল কি র্যা মতীয়া। কি দ্যাখাচ্ছিস্। মতীয়া বলিল, আহা দ্যাখ মুরলা! মর্ত্তধামে যাহা কখনই দেখিস্ নাই তাই দেখে একবার নয়ন যুড়া। ঐ দ্যাখ একটি পুরুষ রতন, কোন রমণীর মনমতধন, রূপের নাগর, রসের সাগর, গাছের তলে নয়ন জলে মাটি ভিজাচ্চে। মুরলা বলিল তাইত ভাই মতীয়া। আহা রূপতোনয়, যেন নিষ্কলঙ্ক চাঁদখানি আকাশ থেকে ভূমে পড়েছে। মতীয়া বলিল, তা নয় ভাই! ঐ অতুলনীয়, ছবিখানি বিধাতা আপনার মনের মতন চিত্রিত করেছে। মুরলা বলিল, না ভাই। তাও নয়, অমনতর সৃষ্টিছাড়া মূর্ত্তি গড়া বিধাতার—কর্ম্ম নয়, সমুদ্র মন্থন সময়ে রত্নাকর হতেই ঐ রত্নটি উঠেছে। মতীয়া বলিল ঠিক বলেছিস্ মুরলে, রত্নাকর হতেই ঐ রত্নটি উৎপন্ন হইয়াছে। নইলে পুরুষের রূপে রমণী মোহিত, এমনতো কোথাও দেখি নাই, এবং শুনিও নাই। মুরলা বলিল মতীয়া। তুই যদি রূপ দেখে মজে থাকিস্, তবে আর লাজে কাজকি, বে করে ভজে ফ্যাল্‌না। মতীয়া মুরলার গগুস্থল ধরিয়া হাসি ভরামুখে বলিল, তুই বর আমি ঘটক হই। মুরলা বলিল, উহার বে হতে আর কি বাকী আছে, বরাননে বে হয়েছে তারির জন্যইত কাঁদ্‌ছে, তাও জানিস্‌নে। মতীয়া বলিল সত্তি নাকি, কোন সৌভাগ্যবতী রমণী এমন পতি লাভ করেছে মুরলা।

মুর। কমল কুমারী।

মতী। তবে কি ইনিই হেমচন্দ্র।

মুর। তা নইলে মনুষ্য ধামে এমন রূপ আর কার আছে।

মতী। জল ডুবি হইতে কেমন করে রক্ষা পেয়েছেন।

মুর। জলহস্তীতে পীঠে বসায়ে বনে রাখিয়ে চলে গেছে।

মতী। মরি মরি, এই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়েইত সখী আমাদের সকল ছেড়ে বনচারিণী হয়েছেন।

মুর। তবে চলনা মতীয়া, আর বিলম্ব কেন, হেমচন্দ্রকে রাজকুমারীর কাছে নিয়ে যাই।

মতী। এখনিই কেমন করে লয়ে যাব, হীরার টুকরা হেমচন্দ্র যে এখন হেমবরণী কমলকুমারীর জন্য অধৈর্য্য।

মুর। ওলো ত্যাথ মতীয়া। সর্পজাতি যতই ফণা ধরুক্ না যতই ফুঁসফাঁস করে গর্জাক না, বেদের কাছে কেঁচোর মতন হয়ে মাথাটি নোওয়াতেই হবে। আমাদের অঙ্গভঙ্গী, আমাদের কটাক্ষ আমাদের কুহক এড়িয়ে যায় এমন পুরুষত দেখিনে চল দেখি, একবার দুইবোনে নয়ন হেনে ওর নিকটে যাই।

পাঠক এ যে নবীনা রমণী দুইটি রূপের ছটায় ফুলের গাছটী আলোকরে দাঁড়িয়ে আছে, উহারা পরিজাতি রমণী। এ যে বলিল, চল ভাই হেমচন্দ্রকে আমাদের রাজকন্যার নিকট লইয়ে যাই, তাহাও সত্য।

বীরেশ্বর পুরস্থ বন বিভাগে কমলকুমারী এবং হেমচন্দ্রে প্রায় কথোপকথন হইত। একদিবস পরীদেশীয় রাজকন্যা আকাশ পথে বায়ুসেবনার্থে বিচরণ করিতে ২ উহাদের উভয়ের প্রতি লক্ষ হওয়ায় পরি রাজকন্যা হেমচন্দ্রের রূপে বিমোহিতা বা ধৈর্য্যহীনা হইয়া প্রত্যহ ঐ স্থানটীতে আসিয়া গোপনিত

ভাবে হেমচন্দ্র এবং কমলকুমারীর কথাবার্ত্তা শুনিতেন। পরীরাজকন্যা জ্যোতিষ বিদ্যাগুণে, উহাদের ভবিষ্যৎ ঘটনা জানিতে পারিয়া, আপন পিতা পরিরাজের নিকট বলিয়াছিলেন মনুষ্য লোকে নির্জন প্রদেশে কিছুদিবস অবস্থিত হইয়া বায়ু সেবন করিব। মাতা পিতার এক মাত্র আদরিণী কন্যা। পরিরাজ, দুহিতার বাক্যে বিস্মৃত হইয়া এই অরণ্য মধ্যবর্ত্তীতে একটী রমণীয় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, তদবধি পরিরাজ কন্যা সহচরী, কিঙ্করীগণ সম্মীলনে কাননবাসিনী হইয়াছেন। পরিরাজ কন্যার নাম সোহিনা, হেমচন্দ্র জলনিমগ্ন হইয়া প্রায় সমস্ত রজনী কোন একটী বস্তুতে দেহ অবলম্বন করিয়া পুনশ্চয় তাহা হইতে নৈরাশ্য জন্য পুনর্ব্বার অতলস্পর্শ জলরাশিতে নিমগ্ন হইলে, জলহস্তী পৃষ্ঠোপরি ধারণ পূর্ব্বক ঐ বন মধ্যে রক্ষা করিয়া যান। পরিরাজ কন্যা সোহিনার অনুমতিক্রমে মুরলা এবং মতীয়া নাম্নী সখী দুইটি হেমচন্দ্রের জন্য, উপেক্ষাকৃতা হইয়া, পুষ্পবৃক্ষোপরি আরোহিতা হইয়া কানন আলোকিত করিতেছিলেন। মুরলা এবং মতীয়া, প্রসূন তরু হইতে অবরোহনা হইয়া উভয়ে উভয়ের করধারণে অতীব সৌন্দর্য্যতায় হেমচন্দ্রের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। হেমচন্দ্র পরিরমণীদ্বয়কে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও অতুলনীয় রূপরাশিতে, বিমোহিত ও বিস্ময়ান্বিত এবং ত্রাসিত হইলেন। রমণীদ্বয় হেমচন্দ্রের প্রতি নয়নশরসন্ধানে বিমোহিত করিলেন। হেমচন্দ্রের প্রতি মুরলা ফুল্লকুসুমহাস্য বদনে বলিল, আকাশের চাঁদ, হৃদয় রতন অযতনে ায় শয়ন কেন, মতীয়া অঙ্গভঙ্গিতে বলিল, নয়নজলে মাটী ভিজায়ে কাহার জন্য কাতর হয়ে সোণার পুতুল

ধূলায় ধূসর। উভয়ের প্রতি বদ্ধাঞ্জলি হতে হেমচন্দ্র বলিলেন, আমি অকৃতজ্ঞ নরাধম, এত নিকৃষ্ট আপনাদের সহিত সখ্যতা বা প্রণয় সম্ভাষণের অযোগ্যনীয়। উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টে পরিহাসতায় সকল বিষয়েই নিন্দনীয় বা ঘৃণিত হইয়া থাকে। তাহাতে ক্ষান্ত হউন। তবে সানুকম্পায় এ জঘন্যজনার প্রতি যদি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ভিক্ষা। এই যুগল প্রকৃতি মূর্ত্তি যদ্যপি স্বর্গস্থা দেবকন্যা হইয়া থাকেন, তবে আমার কমলকুমারীকে ভিক্ষাদানে জীবনরক্ষা করুন। যদ্যপি অপ্সরা কিন্নরী, কি গান্ধর্ব্বি হন তবে আপনাপন স্থানে গমন করুন; কিম্বা যদি বনচারিণী নিশাচরী হইয়া মারূপে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই আমার অনিত্যময় জীবন এদেহ হইতে অন্তর্হিত করুন।

হেমচন্দ্রের মুখে সন্তাপ জনক বাক্য শ্রবণে, মুরলা এবং সতীয়া, উভয়ে খিল খিল শব্দে অট্টহাস্য সহিত হেমচন্দ্রের প্রতি মুরলা বলিল, আমরা ভাই দেবকন্যা নই যে তোমার কমলকুমারী এনে দেব। এবং অপ্সরী, কিন্নরী, গন্ধর্ব্ব রমণীও নই, যে তোমায় গীতবাদ্যে পরিতোষ করিব। তবে বনচারিণী রাক্ষসী যাহা বলিয়াছ সেই কথাটীই সত্য, কিন্তু তোমাকে এই স্থানেতে খাইব না, আমাদের সকলেরই উপর একটি কর্ত্রি আছেন, তাঁহার সেবা হইলেই আমরা পরিতুষ্ট হইয়া থাকি। তবে চল আর বিলম্ব করিও না আমাদের কর্ত্রি কয়দিন পর্য্যন্ত অনাহারী আছেন। হেমচন্দ্র সাহসান্বিতে বলিল চলুন, প্রস্তুত আছি। এ জীবন বর্জ্জন জন্য সুখকর ভিন্ন আশঙ্কান্বিত নই এই বলিয়া হেমচন্দ্র গাত্রোত্থান করিলে পরীকন্যাদ্বয় দুই পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া

হেমচন্দ্রকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া উভয়ে হেমচন্দ্রের উপর করধারণে প্রত্যাগত হইল।

মুরলা ও মতীয়ার মধ্যগত হেমচন্দ্র গমন করিতে করিতে, মনে মনে কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অনিত্যময় সংসারে বৃথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। পিতার অর্থব্যয় করিয়া বৃথায় ষড়শাস্ত্র শিক্ষিত করিয়াছিলাম। কেনই বা কাঙ্গালিনীর কন্যা ভাবিয়া বালিকা কমলকুমারীকে মমতায় স্নেহ করিয়াছিলাম। কেনই বা অসীম যত্ন সহকারে কমলকুমারীকে বিদ্যাভ্যাস দিয়া বাক্‌দেবী সমা বিদ্যাবতী, সাবিত্রী সমা বুদ্ধিমতী, সীতাসমা গুণবতী কারয়াছিলাম। আমি যদি কমলকে না ভাল বাসিতাম, না বিদ্যা শিখাইতাম, তাহা হইলে এতদিনে কমলের বিবাহ হইত, এতদিনে কোন গৃহস্থ গৃহের বধূ হইয়া সুখে সচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। গুণবতী, শান্তমতী কমল, এতদিনে পতি-গৃহ উজ্জ্বলিত করিত। তাহা না হইয়া হিতে বিপরীত হইল, এ অভাগ্যের সহিত ভালবাসাবাসী, হইয়া কমলের সকল সুখই অন্তর্হিত হইল। অভাগ্যের সহবাস ইচ্ছায় ইহজনমের মত, কমলের সকল আসাই নৈরাশ্য হইল। দুঃখিনী জননীকে চিরদিনের জন্য শোকাগ্নিতে দগ্ধিভূত করিয়া, কমল মানবী লীলা সম্বরণ করিল।

হেমচন্দ্রের বক্ষে আজীবনের জন্য কমল বিচ্ছেদরূপ শক্তিশেল বিদ্ধ করিয়া, কমলকুমারী ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। আর না আর না, আর নিমেষ সময় জন্যও জীবিত থাকায়, এ পাপ জীবনে সুখোদয় নাই। আমি সুপথগামী, বা কুপথগামী জন্যই হউক পিতার নিকট বিষদৃষ্ট হইয়াছি। অথবা, নির্দ্দোষিতা

জননীকে চিরদিনের জন্য পুত্রশোকাগ্নি রূপ শরনিক্ষিপ্ত করিয়াছি। সেই সকল পাতকের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অপমৃত্যু প্রায়, মৃত্যুর কবলিত হইয়া, অগ্নিপরিবর্ত্তে রাক্ষসের উদরস্থ হইতে হইবে।

সূর্য্যদেব পশ্চিম চূড়ায় প্রবেশ করিলেন, সায়াহ্ন সময়, সন্ধ্যাদেবীর সমাগমে চারিদিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে বিহঙ্গকুল আসিল। আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষে উপস্থিত হইয়া আপন আপন শাবকগণ সহিত কলধ্বনিতে সমূহ বনস্থল মাতাইতে লাগিল। ক্ষণেক বিলম্বেই নিস্তব্ধ হইল।

ঘোর তিমিরাবৃত নির্জ্জনারণ্যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হইল। সমস্তই নিষ্পন্দীভূত, বৃক্ষের পল্লবটি পর্য্যন্তও স্থিরকৃত। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শব্দহীন এবং দৃষ্টহীন অরণ্যে ক্ষণসময় জন্য তিষ্ঠতা হইতে কাহারও সামর্থ্য নাই। রাত্রি চারিদণ্ড, ঘোরারণ্যের মধ্যবর্ত্তী পরিরাজ কন্যার প্রসাদটি আলোকিতময়। প্রবলাদি হীরক খচিত বিচিত্র চিত্রিতময় পুরীখানি অমরাবতী অপেক্ষাও উজ্জ্বলিত হইয়া, রমণীয় শোভা সম্পাদন হইয়াছে। বৃহৎ অট্টালিকার প্রতিফটকে, প্রতিদ্বারে সশস্ত্রে, পরী শাস্ত্রী, পরী সিপাহী, পরী প্রহরী সকল কার্য্যে নিযুক্ত। প্রতিস্থানে মণিময় আলোকে উজ্জ্বলিত। একটী বৃহৎ কক্ষে স্বর্ণময় পালঙ্কে পরিরাজ কন্যা সোহিনা সমাসীনা হইয়াছেন। চারিদিকে সখীগণ বেষ্টিত উভয় পার্শ্বে উভয় কিন্নরী দ্বারায় চামর ব্যজন হইতেছে। সুবাসিত পুষ্পালঙ্কারে রাজকন্যা পরিশোভিতা হইয়াছেন। সহন্বিতা সহচরীবর্গেও ফুলসাজে সজ্জিতা। সুবাসীত সৌগন্ধিক ছটায় কক্ষময় আমোদিত করিয়াছে। প্রকোষ্ঠের চারিকোণায় চারিটি সৌগন্ধময়, তরু সংস্থাপনা, উহার শাখা প্রশাখা সকল এবং

বিপুল পল্লব, সকলও স্বর্ণময়, গুচ্ছ গুচ্ছ মুকুতার ফলে, অপরিব্যাপ্ত হীরা এবং মতির ফলে কৌতুকাবহ জ্যোতির্ম্ময় আলোকিত হইয়া কক্ষটি রমণীয় সৌন্দর্য্যময় হইয়াছে। হীরামতির বৃক্ষের জ্যোতিতে নবযৌবনা রাজনন্দিনী রূপের জ্যোতিতে, অমরাবতীকেও হীনতা হইতে হইয়াছে। এ সময় রাজকুমারীর মতীয়া এবং মুরলা সখীদ্বয় হেমচন্দ্রকে মধ্যবর্ত্তীতে কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলে, পরিরাজ নন্দিনী ত্রস্তান্বিতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতীব যত্ন সহকারে কমল করে হেমচন্দ্রের হস্তাবলম্বনে হাস্যাননে আসিতে আজ্ঞা হউক, আসুন, সানুগ্রহে আসন পরিগ্রহণে দাসীকে কৃতার্থ করুন। রাজকন্যার রত্নাসনে হেমচন্দ্র উপবেশন করিলেন, বামভাগে রাজকুমারী সোহিনা আসীনা হইলে, দাসীগণ কর্ত্তৃক উভয়াঙ্গে সৌগন্ধিক বর্ষণ, চামর ব্যজন হইল! সৌগন্ধিক ছটায় সখীগণের হাসির ঘটায় হীরক বৃক্ষের সৌজন্যতায় হেমচন্দ্রের মন প্রফুল্লিত হইল। ক্ষণবিলম্বেই চাঁদে মেঘ ঢাকার ন্যায় হেমচন্দ্রের মুখখানি বিবর্ণিতা হইল। হেমচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, ইহা সকলই ভোজবাজির ন্যায় মিথ্যাময়। মণিমুক্তা খচিত মনোরম্য বৃহৎ অট্টালিকা, সোণার গাছে মুক্তার পাতা, হীরামতির ফল, রমণীগণের নবযৌবন মিলিত সৌন্দর্য্যময় রূপরাশি, এ সমস্তই মিথ্যাময়, ইহারা রাক্ষসী, রাক্ষসীর মায়াতে সকলিই হইতে পারে। মায়াবলে এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, আমাকে ভুলাইবার জন্য মায়াবলে সকলেই রূপসী সাজিয়াছে, রাক্ষস, রাক্ষসীর মায়া সর্ব্বনেশে মায়া, মায়াতে মুগ্ধ করিবে, আর ক্ষণবিলম্বেই সর্ব্বনাশ করিবে। হেমচন্দ্র মনে মনে এইরূপ আতঙ্কিত হইতেছেন। এই সময় সরলা

সোহিনার প্রতি বলিল, রাজকুমারী! আমরা যে রাক্ষসী, তুমি যে আমাদের কর্ত্রী সহচরী, তাহা যুবক হেমচন্দ্র জানিতে পারিয়াছেন। কমলকুমারীর বিচ্ছেদে শোকাতুরা হইয়া হেমচন্দ্র আমাদের বলিয়াছিলেন, তোমরা আমায় শীঘ্র বিনাশ কর। তাহাতে আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের প্রধানা সহচরী অনুমতি ভিন্ন কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সেই জন্য হেমচন্দ্রকে তোমার নিকট আনিত করিয়াছি, তোমার বিচারে যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর। পরিরাজকুমারী হাস্যমুখে বলিলেন, হেমচন্দ্র, প্রাণেশ্বর হৃদয় রতন। তোমার কমলকুমারীর জন্য কাতর হইয়াছ। আমাদিগকে রাক্ষসী জ্ঞানে আতঙ্কিত হইয়াছ। আমরা রাক্ষসী নই, দেবী নই, অথবা মানবীও নই, এ অধিনী পরীস্থানীয় পরিজাত। সোহিনা আপন পরিচয় এবং হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভে আসক্তা হওয়া হেমচন্দ্রের সহ সম্মীলন আশায় এই বনস্থ হর্ম্ম নির্ম্মিত, হেমচন্দ্রকে আনিবার জন্য, মুরলা এবং মতীয়ার প্রতি আদেশ করণ, এই সমস্ত হেমচন্দ্রের নিকট বর্ণনা করিলে, হেমচন্দ্র আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং আনন্দ চিত্তে সহাস্য বদনে, সোহিনার প্রতি বলিলেন, আপনি স্বর্গভূমি সম পরীস্থানীয় মহানাস্থে রাজকন্যা। আমি অকৃতজ্ঞ সামান্য মানবজাতি, এ অধীনের সহিত আপনার সন্মীলিত বাচ্যতা কেবল হাস্যাস্পদ মাত্র। রাজকুমারী হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, প্রাণেশ্বর! তুমি আপনাকে অকৃতজ্ঞ জানাইয়া আর আমারি চিত্তবৃত্তিকে নিস্তেজিত করিও না। আমরা পরীজাতি. তুমি মনুষ্য, ঐজন্য আপনাকে নিকৃষ্টতা ভাবিতেছ, তাহা মনেও করিও না। দেখ হেমচন্দ্র! তুমি যেরূপ মনুষ্য, আমি প্রথম

দর্শনেই তাহা জানিয়াছি। লক্ষণে দেখিতেছি, তুমি দেবদুর্ল্লভ শাপগ্রস্থ জন্য মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি যথাবিহিত, শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, মোহাদি বৈর সকলকে শাস্ত্রজ্ঞ গুণে পরাভূত করিয়াছ। তোমার সহিষ্ণুতা দর্শনে সন্তোষিত চিত্তে ঐকান্তিকতায়, আমার হৃদয়রাজ্যে তোমায় অধিষ্ঠিত করিয়াছি। আজীবন কাল জন্য এ জীবন মহাত্মন হেমচন্দ্রেতে সমর্পণ করিয়াছি। রাজকন্যা সোহিনা হেমচন্দ্রের প্রতি এইরূপ আসক্ততা বা ভালবাসা জানাইলে, হেমচন্দ্রও টলিয়া পড়িলেন। নবীনা, রূপসম্পন্না সোহিনার সৌন্দর্য্যতায়, মিষ্টালাপে হেমচন্দ্র বিমোহিত হইলেন। যুবকযুবতী উভয়েই প্রণয় সলিলে টলিয়া, গলিয়া, মজিয়া পড়িল। সোহিনার সম্মতিক্রমে সহচরী পরিকন্যাগণে সুমধুর স্বর মিশ্রিত সঙ্গীত বাদ্য, নৃত্যাদিতে যুবক হেমচন্দ্রের মনোহরণ করিতে লাগিল। রাজকুমারীর ঈঙ্গিতে কিঙ্করী কর্ত্তৃক সুরাপাত্র আনিত হইল। অন্যা কিঙ্করী হীরকময় পাত্রে সুরা ঢালিয়া রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করিলে সোহিনা হেমচন্দ্রের প্রতি সুরা পান জন্য অনুরোধ করিলে, হেমচন্দ্র ঈষদ মুখবিকৃতিতে বলিলেন, ইহা আমাদের পানীয় নয়, তুমি পান কর। সোহিনা অঙ্গভঙ্গী, এবং নয়ন ভঙ্গীতে হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, ইহা কি ঘৃণিত দ্রব্য মনে করিয়াছ। সুধাপানে অনিচ্ছুক হইতেছ কেন? তুমি শাস্ত্রজ্ঞতা হইয়াও এরূপ আনন্দকর দ্রব্যের মর্ম্ম জান না। অরসিক জনার ন্যায় সুধাপানে অবজ্ঞা করিও না, শীঘ্র পান কর। রাজকুমারীর চাতুর্য্যতা বাক্যে হেমচন্দ্র বিমোহিত হইয়া, অবাধে সুরাপানে রত হইলেন

রাজকন্যা সঙ্গিনীগণ সহিত সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঢাল-সুরা দে পিয়ালা, পিওমেরী পিয়া। আবার খাও, আবার ঢাল, আবার গাও আবার নাচ, দে পিয়ালা। সুরাপানে, নৃত্য-গীতে সকলেই আনন্দিত, সকলেই বিমোহিত। নাচের তরঙ্গ সঙ্গীতের লহরী, সৌগন্ধিকের ছড়াছড়িতে যুবক যুবতীর প্রণয়-তরঙ্গ উচ্ছ্বলিত। এক এক বার পরিরাজ কন্যা নবযুবতী, যুবক হেমচন্দ্রের অঙ্গে চলিত, এক এক বার নবযুবক যুবতীর কোম-লাঙ্গে ঢলিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে ফুলের গাছ চাঁদেরফল সম দীপ্ত দর্শনে, সখীগণের আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল। নব প্রেমিক প্রেমিকার ফুলশরে অধৈর্য্যতা দেখিয়া, সঙ্গিনী বর্গে অদ্য রজনীর জন্য উৎসবে ক্ষান্ত হইল। বরকন্যা বাসরগৃহে শুভাগমন করিলেন সঙ্গীগণও নিজ নিজ শয়ন কক্ষে বিদায় হইল।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ধামে রাজা হইয়াছেন। হেমচন্দ্র পরিনন্দিনী সোহিনার প্রণয় জালে জড়িত হইয়া সকলই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কোথায় মাতা কোথায় পিতা, কোথায় বা প্রাণ সমা প্রিয়তমা সোনার প্রতিমা কমলকুমারী, সকল চিন্তাই চিত্ত হইতে দুরিভূত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এখন সুরা-পানে প্রবত্য, আর সোহিনার প্রেমে উন্মত্ত। চোখে চোখে, মুখে, মুখে, ভিন্ন যুগল অঙ্গ ক্ষণ সময় জন্যও বিচ্ছেদ নাই। রাত্র উপস্থিত হইলেই নৃত্য গীত সহিত রাজকন্যা, এবং সঙ্গিনী-গণ সহ মহোৎসব, দিবাভাগে আহার বিহার, নিদ্রা, এইরূপ বিলাসানন্দে প্রায় তৃতীয় বর্ষ অতীত হইল। এক দিবস হেমচন্দ্র দিবাবিভাগে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন। হেমচন্দ্রের

সহিত কমলকুমারীর যাঁকযমকে বিবাহ হইয়াছে, কমলকুমারী এখন পূর্ণা যৌবনায় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমানা হইয়াছেন। কমল-কুমারীর পিতা কারাবাসে মুক্তিলাভ পাইয়াছেন, কমলকুমারীর মাতাও গৃহে আসিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পিতার সহিত বাদানুবাদ মিটিয়া গিয়া পূর্ব্বসম প্রণয় সংস্থাপন হইয়াছে। বীরধ্বজ সিংহ এবং শৈলেশ-নন্দিনী বীরেশ্বরপুরে শুভাগমন করিয়া, হেম-চন্দ্রের সহিত কমলকুমারীর পরিণয় কার্য্য সমাধান করিয়াছেন। হেমচন্দ্র এবং কমলকুমারী উভয়ের বিশুদ্ধ প্রেমের অন্তশীলা বহিয়া যুবক যুবতীর প্রণয় সরোবর উথলিত প্রায়। একদিবস যামিনীযোগে, বিলাসকক্ষে হেমচন্দ্রের স্কন্ধনে করকমল স্থাপনা করিয়া কমলকুমারী হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, তুমি অতি নির্ম্মম, আমি যার পর নাই কষ্ট পাইলাম, তবে তুমি আমায় বিবাহ করিলে। হেমচন্দ্র হাস্যবদনে কমলকুমারীর প্রতি বলি-লেন, তুমি অতিশয় অরসিকা। রসিকে অরসিকে সম্মীলন অস-ঙ্গত জানিয়া প্রজাপতি অমনোযোগ করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়কেই বিচ্ছেদে শোকাতুরা দেখিয়া প্রজাপতির মমতা জন্মিল, তাহাতেই আমাদের বিবাহের সম্মীলনে বিলম্ব হইল, আমি এ বিষয়ে নির্দ্দুষি জানিবে।

ফুল্ল কমল সদৃশ হাস্যাননে কমলকুমারী হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন তুমি আমার রসিক চূড়ামণি রসের সাগর, রসের নাগর, রসরাজ, তুমি আমি যাহার নিকট শিক্ষিত হইয়া অরসিকা হইয়াছি, তিনিই বুঝি গণ্ডমুর্খ। হেমচন্দ্রই কমলকুমারীর শিক্ষক, তজ্জন্য কমলকুমারীর নিকট পরাস্ত হইলেন। এইরূপ কৌতুকা-দিতে দম্পত্য প্রণয় কতদিবস বহির্ভূত হইলে, হেমচন্দ্র সোহি-

নার সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় একদিবস রাত্রিকালে কমল-কুমারীকে নিদ্রিত জানিয়া, সোহিনার নিকট গমনোদ্দেশে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গমন করিলে, কমলকুমারী গোপনীত হইয়া হেমচন্দ্রের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে অন্ধকার জনিত কমলকুমারীর কষ্টকর হইলে, হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, আমায় একক রাখিয়া কোথায় যাইতেছ। হেমচন্দ্র পশ্চাৎমুখ হইয়া কমলকুমারী আসিতেছে দেখিয়া কমলকুমারীর প্রতি বলিলেন, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি কার্য্যবশতঃ অন্য স্থানে যাইব। এই বলিয়া বেগে গমন করিতে লাগিলেন। কমলকুমারী বলিলেন, পথ চিনিতে পারিব না, একক কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব, আমায় ফেলিয়া যাইও না, ফিরিয়া যাইস। হেমচন্দ্র, কমলকুমারীর কথায় পুনশ্চয় কোনও উত্তর না দিয়া অধিক বেগে গমন করিতে লাগিলেন। কমলকুমারীও সাধ্যমত দ্রুতগামী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ওগো? আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, তোমার পায়ে পড়ি একবার দাঁড়াও। কমলকুমারীর কাতরতা-যুক্ত বিনয়ান্বিতে হেমচন্দ্র ভ্রূক্ষেপ মাত্রও না করিয়া গমন করিলেন। কিয়ৎসময় অতীত হইলে কমলকুমারীর নীরব শুনিয়া হেমচন্দ্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, অধিক দূরবর্ত্তিতে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষসী কমল-কুমারীকে লইয়া দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। প্রাণসম-কমলকুমারীকে রাক্ষসী অপহরণ করিল দেখিয়া এইবার হেম-চন্দ্রের মমতা হইল। হেমচন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন, এবং উচ্চ রবে মারমার করিয়া কমলকে মুক্ত করিবার জন্য রাক্ষসীর

দিকে ধাবিত হইলেন। রাক্ষসী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে, মনুষ্য হইয়া কেমন করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইবেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পত্নীর আশায় নিরাশা হইয়া, হেমচন্দ্র রোদন করিতে লাগিলেন। অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং স্বপ্নও ভঙ্গ হইল। হেমচন্দ্র শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিচলিত-চিত্তে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, সোহিনা বলিলেন, অকস্মাৎ চঞ্চলিত হইলে কেন, বোধ হয় কিছু স্বপ্ন দেখিয়াছ। হেমচন্দ্রের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মৃতিপটে উদিত হইল গুণবতী কমলকুমারীকে মনে পড়িল, হেমচন্দ্র কাঁদিতে লাগিলেন। অমনি দাসী কর্ত্তৃক চামর ব্যঞ্জন হইতে লাগিল, সোহিনা স্বয়ং গোলাপদান লইয়া হেমচন্দ্রের চক্ষে ছিটাইতে লাগিলেন, এবং বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, হেমচন্দ্র? তুমি এরূপ শঠ, আমি তাও জানিনে। তোমার আবার ভালবাসা আছে, আমার সহিত ভালবাসা কেবল মৌখিকতা মাত্র। পরিব্রাজনন্দিনী চক্ষে জল ফেলিলেন, কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, এমন জানিলে পর পুরুষকে ভাল বাসিতাম না, পরের উপর মন ঢালিয়া দিয়া পরাধিনী হইতাম না। পুরুষ মাত্রেই নিষ্ঠুর, নির্দ্দয় নির্ম্মম, তাহা এইবার জানিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম আমি যেমন হেমচন্দ্রকে ভালবাসি, হেমচন্দ্রও আমায় ততোধিক ভাল বাসে, সেইটী আমার মনভ্রান্ত মাত্র। সোহিনার কান্নায় হেমচন্দ্র গলিয়া, ঢলিয়া সমস্তই ভুলিয়া গিয়া সোহিনাতে মিশিয়া গেলেন।

একদিবস রাত্রিকালে আপনার পিতার রাজ্য পরীস্থানী দেশে সোহিনার আপন পৃষ্ঠোপরি হেমচন্দ্রকে লইয়া শূন্যমার্গ

হইতে পরীনগর এবং নিজ পিতৃভবনের সৌজনতা দেখাইতেছেন। এই সময় সোহিনার পিতা কাশ্মীর সাহা ছাদে পরিভ্রমণ করিতে আপন কন্যা সোহিনার পৃষ্ঠে মনুষ্য দেখিয়া বেগে উড্ডীয়মানপূর্ব্বক উভয়কে ধৃতকরত নিজাবাসে আনয়ন করিলেন। এই সময় সোহিনার জননী, কাশ্মীরসাহার মহিষী দেবযানী সমুপস্থিতা হইলেন। এবং মানবজাতির সহিত কন্যার ব্যভিচার দর্শনে বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। কাশ্মীরসাহার চক্ষুদ্বয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইল। ক্রোধাক্ত-চিত্তে সোহিনার প্রতি বলিলেন, দুশ্চারিণী, নৃশংসী, পরীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পিশাচীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিস। পাপিষ্ঠ মানবের সহিত বিলাস ইচ্ছায় কামুকা হইয়া আমার সহিত বঞ্চনায় মনুষ্যলোকে বাস করিয়াছিস। তোর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপ অন্য কিছুই নাই, স্নেহকর অনুরাগব, তোর এই নর-পিশাচের তোর সম্মুখবর্ত্তীতেই শিরোচ্ছেদন করিয়া, পশ্চাতে তোর বিনাশ সাধন করিব। দেবযানী তিতিক্ষান্বিতা সোহিনার প্রতি বলিলেন, ওরে পাপিনী, কুলকলঙ্কিনী! নিষ্কলঙ্ক পিতৃকূলে কালী দিবার জন্যই কি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি। বিবাহ করিব না, পুরুষের মুখাবলোকন করিব না বলিয়া পরিশেষে আমার সর্ব্বনাশ করিয়া ক্ষান্ত হইলি। তুই সর্ব্বনাশী আমার গর্ভে জন্মিয়া সুধাপানে বিরত হয়ে চণ্ডালিনী প্রায় হইলি। কত রাজপুত্র, কত কুলশীল মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রূপবান পাত্র, তোর রূপে মোহিত হইয়া বিবাহ ইচ্ছুকতায় মহারাজের নিকট অনুনয় করিয়াছিল। তুই তাহাদের প্রতি তাচ্ছল্যতায় জঘন্য ঘৃণিতজাতি মনুষ্যতে আসক্তা লইয়া চিত্ত মজাইলি। হা নিশ-

ঙ্কিনী, হা দুর্ভাগিনী, হা দুশ্চারিণী, এখনও আমার সম্মুখবর্ত্তী রহিয়াছিল। এখনও তোর মস্তকে বজ্র নিপাত হইল না। এখনও তোর পোড়ামুখ পুড়িয়া যাইয়া তুই ভস্মীভূত হইলি নে। দেবযানী কর্ত্তৃক সোহিনার প্রতি তিরস্কৃত হইতে লাগিলে কাশ্মীরসাহা ক্রোধচিত্তে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোহিনা নতবদনে দেবযানীর প্রতি বলিল, জননী? আমি এ বিষয় কিছুই জানি না, হেমচন্দ্রের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করতঃ বলিলেন এই পুরুষটী যেন কোনরূপ যাদুবিদ্যা জানে ইহাকে দেখিবামাত্রেই আমি উহার অনুগত হইলাম। ইন্দ্র-জালিক কুহকতাতেই হউক, বা উনি মানব কুলশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হউন, দৃষ্টিমাত্রেই ঐ পুরুষরত্নেতে আমি মন প্রাণ সহিত আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আপনি বৃথায় ভৎর্সনা করিতেছেন, আমি নিতান্তই নির্দ্দোষী। দেবযানী আশ্চর্য্যান্বিতে সোহিনার প্রতি বলিলেন, তোর জ্ঞান গৌরব, মানমর্য্যাদা একেবারেই উৎচ্ছন্নে গিয়াছে, এত বড় স্পর্দ্ধা তুই আমার সম্মুখেই একটা নরাধমের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইলি, উহার প্রণয়ে মন মজাইয়া, রসিয়া গলিয়া মদনোন্মত্তা হইয়াছিস তাহাও আমার নিকট নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ করিলি। হাঁরে মর্ম্মঘাতিনী! তোর দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ তোর পাপ জীবন পরিশেষ জন্য রজনী প্রভাত হইলেই জল্লাদগণের প্রতি মহারাজ নিশ্চিত্ত পক্ষে অনুমোদন করিবেন। তোকে বাঁচাইবার জন্য আমি যে কোনরূপেই প্রতিকার করিতে পারিব না। কেবল আজী-বন জন্য তোর শোকাগুণে পুড়িয়া মরিব। সোহিনা কান্দিতে কান্দিতে দেবযানীর প্রতি বলিলেন, জননী! জীবের জন্ম-

গ্রহণ হইলেই মৃত্যুর অধীনস্থ হইতে হইয়া থাকে, কাহারও অবিলম্বে, কাহাকেও বিলম্বে মরিতে হয়, তাহার জন্য বৃথা চিন্তায় ফলোদয় কি? কিন্তু দুষ্টা হই শিষ্টা হই, আমি আপনার গর্ভজাতাকন্যা, মৃত্যু সময় আমার একটী প্রার্থনীয় পূর্ণিত করিতে হইবে। জনমের জন্য যাঁহাকে এই প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, আমার প্রাণের প্রাণ জীবনধারণ প্রাণেশ্বরের প্রাণটী যে কোনরূপেই হোক আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দেবযানীর প্রতি সোহিনা ঐরূপ বিনীত বাক্য প্রয়োগ করিলেন, এই সময় বিকটমূর্ত্তি দুইজনা অনুচর উপস্থিত হইয়া রাজমহিষী দেবযানীর প্রতি অভিবাদনপূর্ব্বক সোহিনা এবং হেমচন্দ্রকে ধারণ করিয়া দুই জনায় দুইদিকে গমন করিল। মহিষী দেবযানী বস্ত্রাঞ্চলে নয়ানবারি মোচন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

প্রভাত সময় মন্ত্রীবর্গ সহান্বত কাশ্মীরসহ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। দুইজনা কিঙ্কর দ্বারায় সোহিনা এবং হেমচন্দ্র বিচারালয়ে আনিত হইল। রাজকন্যা, সোহিনা এবং হেমচন্দ্রের প্রতি কিরূপ দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহাই দেখিবার জন্য অসজ্জিত পরীগণ নিস্তব্ধে শশঙ্কিতে বিচারস্থলে দণ্ডায়মান সশস্ত্রিক প্রহরীগণ উচ্চরব নিবৃত্ত জন্য সাবধান করিতেছে কাশ্মীরসহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-বৎ চক্ষুদ্বয়, ভীষণ মূর্ত্তিতে, হেমচন্দ্রের প্রতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, তুমি চণ্ডাল হইয়া সুধাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। মর্কট সদৃশ সুমেরু শিখায় পদার্পণ করিয়াছ, পরস্পারে হইবার জন্য অপার জলধিজলে সন্তরণ। তোমার দুবৃত্ত কার্য্যে আমার সুস্থকর চিত্ত চঞ্চলিত হইয়াছে। প্রজ্জ্বলিত

অগ্নিসম আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধীভূত হইতেছে। ঐ দুষ্ক্রিয়ান্বিত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ তোমায় কোন দণ্ডে দণ্ডিত করিলে যে আমার মনাগুণ নির্ব্বাণ হইবে, তাহার জন্য কিছুমাত্রই নিশ্চিত হইতেছে না। কাশ্মীরসাহ হেমচন্দ্রের প্রতি এইরূপ শাসিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া মন্ত্রীবর্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অমাত্য-বর্গ স্তম্ভিত চিত্তে পরিরাজের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই সময় হেমচন্দ্র অর্দ্ধস্ফুটস্বরে, কৃতাঞ্জলিপুটে কাশ্মীরসাহের প্রতি বলি-লেন, মহারাজ! আপনি বিচারপতি, আপনা হইতে সুবিচার ভিন্ন অবিচার হইবে না, সুবিচারে যেইরূপ অনুজ্ঞা প্রয়োগ হইবে, তাহাতেই এ অধীন পরিতুষ্ট হইবে। পরিপতি উচ্চরবে বলিলেন তোমার জন্য অবিচার সুবিচার করিতে কি আছে, আমি স্বয়ং যখন তোমার কুক্রিয়তা দর্শন করিয়াছি, তখন বিচার বা প্রমাণের প্রয়োজন কি, এখন তুমি কোনরূপে মরিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহাই প্রকাশ কর।

হেমচন্দ্র বলিলেন ক্ষত্রবংশ বীরপুরুষ মরিবার জন্য ভীত নহে, এই অনিত্যকর দেহ আপনি যেইরূপে বিনাশ সাধন করেন তাহাতেই সন্তোষিত আছি। কিন্তু মরিবার অগ্রে মহা-রাজের নিকট একটী নিবেদন করিতে মানস হইয়াছে, মহা-রাজের অনুজ্ঞার অপেক্ষা। প্রধান মন্ত্রী হেমচন্দ্রের প্রতি বলি-লেন, অবশ্য এখন তোমার বক্তব্য বিষয় অনায়াসে হুজুরের নিকট প্রকাশ করিতে পার। কাশ্মীরসাহার প্রতি হেমচন্দ্র বলিলেন মহারাজের প্রতি একটী প্রশ্নের মীমাংসা জিজ্ঞাসিত হই। পরীস্থানীয় পুরুষ বা প্রকৃতিবর্গকে মনুষ্য মাত্রের ইচ্ছা হইলেই কি দর্শন পাইতে পারে। দ্বিতীয় মন্ত্রী বলিলেন তাহা

কোনক্রমেই হইতেই পারে না। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, কেবল তাহাই কেন, কি সংসারী, কি তাপসী, যোগ সাধক বা তান্ত্রী-কাদি মনুষ্যমাত্রেই পরীস্থানীয় দিগকে ইচ্ছানুক্রমে দেখিবার সাধ্য রহিত। কাশ্মীরসাহ মন্ত্রীবর্গের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর-স্বরে হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, তাহা হইলে এই ব্যক্তি এক প্রকার নির্দ্দোষিত, সোহিনার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ক্রোধান্বিতে বলিলেন, এই পাপিনীই সকল নষ্টামীর অগ্রগণ্যা, পিশাচী হইতেই পৈশাচীক ব্যবহার সমাধান হইয়াছে। স্বজা-তির কুলশীলময় রূপবান পাত্র সকলে তাচ্ছিল্যতায় মনুষ্যাতে উন্মত্তা হইয়া আমার কুল মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিলি। তোর ন্যায় কুলাঙ্গিণী কন্যার মস্তক ছেদন কার্য্য আমার সম্মুখবর্ত্তিতে পরিসাধনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। রাজকন্যা সোহিনা কাশ্মীর সাহের প্রতি অঞ্জলিপুটে, বাষ্পপূর্ণিত নয়নে বলিলেন, পিত! তাহা হইলে তোমার অধমা কন্যা সন্তুষ্টতা লভ্য করিবে, হেম-চন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, এই নির্দ্দোষিত মানবটীকে কৃপা করিয়া পরিমুক্ত করুন, আর অতি শীঘ্রই আমার বধ্য কার্য্যে অনুমোদন করিয়া আপনি শান্ত লাভ করুন। সোহিনার মৃত্যু ইচ্ছুকতায়, হেমচন্দ্র কাতরে, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মহা-রাজ! অবিচার করিবেন না অবিচারকতায় অধর্ম্মের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, পূর্ণময় সংসারে অধর্ম্মাশ্রয়ে উজ্জলিত বংশ সমূহ রাজ্য সহিতে মলিনীতাময় হইবে, এবং স্ত্রীহত্যারূপ মহাপাতক জন্য স্ববংশে উচ্ছন্নতা হইয়া ঘোর নরকভোগীতে অসীম যাতনাদায়ক হইতে হইবে।

মহারাজ। বিচারানুক্রমে ঐ দুষ্কলতা এ অধম হইতেই

সংঘটিত হইয়াছে। আমিই বামন হইয়া চন্দ্রে হস্তক্ষেপং করিয়াছি, আমিই পঙ্গু হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমিই নরাধম হইয়া দেবী সমা আপনার কন্যাকে কলঙ্কিতা করিয়াছি, মহারাজ! এই পাপিষ্ঠের জীবনান্ত করিয়া, আপনার ক্রোধাত্মাকে সুশীতল করুন। কাশ্মীরসাহ ভয়ঙ্কর রবে হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন পামর, নরাধম, সাবধানতায় আমার সহিত বাক্যালাপ করিও। নচেৎ প্রবঞ্চকতায় প্রায়শ্চিত তোমার প্রতি এই দণ্ডেই সমাধিত হইবে। প্রণয় বিহ্বলতায় হিতাহিত রহিত হইয়া, তোমরা উভয়েই মমতাজালে জড়ীভূত হইয়াছ। উভয়েই উভয়ের প্রাণরক্ষার জন্য যত্ন পাইতেছ। কাশ্মীরসাহ কাহারই প্রলোভনে, বিনয়ান্বিতে চাতুর্য্যতাময় মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়া থাকে না। মন্ত্রী, বান্ধব স্বজনাদি যে কেহই হউক আমার সন্নিধ্যে মিথ্যা প্রস্তাবনায় তদ্দণ্ডেই প্রাণদণ্ড করিয়া থাকি। এই নিমেষ মধ্যেই দুশ্চারিণী সোহিনার শিরোচ্ছেদন করিয়া গলগ্রহ হইতে নিষ্কৃত হইব। মন্ত্রীবর্গ দ্রষ্টাবর্গ, নিস্পন্দতায় অথচ কম্পান্বিতে কাশ্মীরসাহের প্রতি চাহিয়া রহিল এই সময়, এলোথেলো বেশে পাগলিনী প্রায় দ্রুতগমনে রাজমহিষী দেবযানী রাজসভায় সমুপস্থিতা হইয়া, স্বকাতরে উচ্চরবে, পরীরাজের প্রতি বলিলেন, কখনই হইবে না, এ দেহে জীবন থাকিতে, আমি সোহিনার প্রাণদণ্ড দেখিতে পারিব না। এই বলিয়া দেবযানী, রাজকুমারী সোহিনাকে ক্রোড়াগতপূর্ব্বক শোকাতুরায় নয়ন বারিবর্ষণে কাশ্মীরসাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপন মস্তক, বাড়াইয়া বলিলেন, অগ্রে এই গলদেশে অসি সঞ্চালিত হউক, পশ্চাতে যাহা অভিরুচি হয় করিবেন। নচেৎ

প্রাণপ্রতিমা, প্রাণাধিকা সোণার পুতলী সোহিনার অঙ্গস্পর্শ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই হউক।

দেবযানীর, মমতারূপ পরিশোচনায় কাশ্মীরসাহ বলিলেন মহিষী! সামান্য রমণী সমা এরূপ হতজ্ঞানা হইলে কেন। সোহিনার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া, ঐ কুলঘাতিনী, পাপিনী, কলঙ্কিনীতে এখনও কন্যা জ্ঞানে স্নেহ জন্মাইতেছ। এখনও উহার পাপময় মুখদর্শনে মুগ্ধ হইতেছ। দুশ্চারিতার অঙ্গস্পর্শ এবং ক্রোড়স্থ করিতে তোমার নির্ম্মলতা চিত্তে ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে না। দেবযানী বলিলেন, মহারাজ! ঘৃণায় লজ্জায় ক্রোধে, সোহিনাকে দেখাইয়া, এই হতভাগিনীর প্রতি একবার বিষদৃশ্য হইতেছে, আবার মুখখানির দিকে চাহিলে, অপত্য-স্নেহের আবির্ভাব হইয়া প্রাণ যেন কেমন করিতে থাকে, জীব-নাত্মা চঞ্চলিত, সোহিনা হীনা পৃথিবী আঁধারময় দেখি। মহা-রাজ, আপনিই বলুন দেখি, আমার সোহিনাকে মনে হইলে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিব। সোহিনা বিনে, এই রাজ্য ঐশ্বর্য্য সকল বিষদৃশ্য সম অসহ্যতা হইয়া আজীবনাবধি চিন্তানলে হৃদয়পিণ্ড দাহনিত হইবে। জনমের মত সকল সুখ বাসনা, সকল কামনা নির্ব্বাহিত হইয়া, দুঃখময় মহাসাগরে নিমগ্না হইতে হইবে। কাশ্মীরসাহ বলিলেন, মহিষী! তাহা হইলে, এই অনুদ্বাহ দূষিত কন্যা লইয়া, মানমর্য্যাদা, কুল, শীল, জ্ঞান গৌর-বাদি সকল ভস্মাবৃত করিবে, ইহাই কি মানসিক করিয়াছ।

কাশ্মীরসাহের প্রতি দেবযানী বলিলেন কেন, মানসম্ভ্রমাদি বিনষ্ট হইবার কারণ কি? পরীজাতীয় কি পুরুষ কি রমণী কি বালক, কি বালিকা, অনাচার বা অধর্ম্মাচরণে কাহারই

প্রবৃত্তি জন্মায় না। হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন, বিবেচনায় হয় এই মনুষ্যাকার দেহে কোনরূপ গুণত্য মিশ্রিত আছে। প্রত্যাঙ্গের সুলক্ষণ দর্শনে যেন একটী মহাত্মা বই অন্য জানায় না। আরও দেখুন, মহারাজ! ঐ মহানজ্ঞান গ্রাহী নরপুঙ্গবটির সুমধুর বাক্যগুলি শুনিলে কর্ণকুহর সুশীতল হইতে থাকে, মাধুর্য্যতা দর্শনে চিত্তের মালিনতা বিদূষিত হইয়া নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। উহার সৌন্দর্য্যময় রূপরাশীতে, গগনস্থ সুধাংশুসম পরীকুল আলোকিত করিয়াছে। সামান্য রমণীর ন্যায় ঐ অপরূপ রূপদর্শনেই যে মোহিনী বিমোহিতা হইয়াছে তাহা কিছুতেই অনুভূত হইতেছে না, উহাতে নিশ্চয় পক্ষেই কোনরূপ নিগূঢ়ত্বাক আছে। সত্য মিথ্যা প্রকাশিত হইবে, মহারাজ! প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্বানদিগের দ্বারায় ঐ নব যুবকের পরীক্ষা লইতে অনুমোদন করুন, বিদ্য বুদ্ধি মাধুর্য্যতা, এবং সাধকতা বিশিষ্ট হইলে, বিনাপত্যাতে কন্যাদানে নিয়োজিত হইবেন। পুণ্যফলে তপস্যার প্রভাবে বা যোগবলে, মনুষ্য জনে যেমন দেবলোকে গমন করিয়া থাকে, ইহাও তাদৃশ হইতে আশ্চর্য্য কি?

মনুষ্যমাত্রে, যতই জ্ঞানবান, বিদ্বান এবং সমাজিকতায় মান্য গণ্যনীয় হউন না কেন, গজগতি, দ্বিজরাজমুখী দিব্যাঙ্গনা প্রমদার কটাক্ষ শরের নিষ্পিড়নে সকলই ভষ্মসাৎ হইয়া যায়। তপ যপ, সমাধি বিধিতে বিষদৃগ্ধ হইয়া থাকে। কাশ্মীরসাহের ক্রোধের প্রখরতা কর্ত্তৃত্বতা, দাম্ভর্য্যতা সকল দেবুরাণীর পরিশোচনায়, ব্যাকুলিতায়, এবং অঙ্গ ভঙ্গী দারায় উপদেশকতায়, জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণমাত্রেই ভঙ্গপ্রায় হইল। কাশ্মীরসাহ, শান্তচিত্তে অমাত্যবর্গের প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন,

মহিষীর ঈদৃশ বাচতার বিষয় আপনাদের চিত্তে কোনটি শ্রেয়স্কর বোধ হয়। মন্ত্রীবর্গ জোড় করে দণ্ডায়মান হইলে, প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীরসাহেবের প্রতি বলিলেন, মহারাজ! রাজমহিষীর প্রশ্নটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের অনুভূত হইতেছে। উহাতে সকল দিকই বজায় থাকিবে। অথচ, রাজকুমারীর পরিণীতা কার্য্য ইতিমধ্যেই সমাধিত করা অতীব অবৈধতা হয়। মর্ত্ত-লোকে বিশ্রাম লাভ জন্য যত দিবসাবধি নিয়োজিত হইয়াছে, সেই নিশ্চিত সময় জন্য রাজকুমারী নরলোকে প্রত্যাগমনে তুষ্টি লাভ করুন। পুনশ্চ রাজ দুহিতার পরীলোকে পুনরাগমন সময় পর্য্যন্ত, হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া, ঐ নর যুবকের কারাবাসে অবস্থিত হয়। তাহা হইলেই উভয় প্রণয়ের তাৎপর্য্য নিশ্চিত হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর মন্ত্রণার যথোচিত জ্ঞানে কাশ্মীরসাহ অনুমোদনকরতঃ সভাভঙ্গ পূর্ব্বক সকলে যথাস্থানে গমন করিলেন। পরী অধীশ্বর এবং সোহিনা সহিত দেবযানী অন্তঃপুরে গমন করিলেন। জনেক অনুচর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হেমচন্দ্রকে কারাবাসে গমন করিতে হইল।

সোহিনা পিতা-মাতার নিকট বিদায় লইয়া বনভূমিস্থ আপন অট্টালিকায় উপস্থিতা হইয়া দেখিলেন, সহচরী এবং কিঙ্করীবর্গ শোকাভিভূতায় সকলেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রোদন করিতেছে। রাজকন্যা সোহিনাকে সমাগতা দৃষ্টে সকলে হর্ষোৎফুল্ল বদনে সোহিনার প্রতি অন্তর্ধ্যান কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, রাজকুমারী আদ্যন্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া, হেমচন্দ্রের বিচ্ছেদে ধৈর্য্যহীনায় রোদন করিতে লাগিলেন, সহচরী শোকাতুরা হইলেন দেখিয়া,

মুরলা নাম্নী সঙ্গিনী হাস্যবদনে বলিলেন, রাজনন্দিনী! তাহার জন্য আর চিন্তিত হইতে হইবে না। অদ্য রাত্রেই যুবরাজের সহিত তোমায় সম্মিলিত করাইয়া তোমার মুরলা সঙ্গিনার কৌশলতা দেখাইব।

মুরলার হিতকর বাক্যে হর্ষ এবং বিষাদ মিশ্রি মিশ্রিত চিত্তে সোহিনা বলিলেন, সখি! জ্বালার উপর আর জ্বালাইত করিও না বিষাক্ত দেহে অগ্নি নিক্ষেপণ করিলে দ্বিগুণ যাতনা বই সুস্থতার আসা থাকে না। আমার এই দুঃসময় ভিন্ন পরিহাসকর্তার আর কি সময় পাইলে না। মুরলা হাস্যমুখে বলিল, আমোদ আহ্লাদ করিতে হইলে সুদিন কুদিনের জন্য গণক ডাকিতে হইবে না কি। ইচ্ছা হইলেই, হাসব, নাচব গায়িব। সোহনার দুইটি হস্ত নিজহস্তে ধারণ করিয়া, এসনা সখি! একটীবার দুই জনাতে নাচি এই বলিয়া সোহিনাকে ক্রোড়স্থ করতঃ চিবুকধারণ-পূর্ব্বক, মুরলা নৃত্য করিতে করিতে বলিল।

ভাবনা কিগো বিনোদিনী, আনব তোমার গুণমণি।
শ্যামের বামে রাই বসাব, হোক যামিনী হোক যামিনী ॥
আর কেঁদনা আর ভেবনা শুখায়েছে বদনখানি।
আনব রতন করে যতন যাকনা আগে দিনমণি ॥

মুরলা যত প্রবোধ করিতেছে, সোহিনা ততই শোক-সাগরে উথলিত হইতেছে। মুরলার স্কন্ধে মস্তক অবনত করিয়া ফুঁশ ফুঁশ শব্দে ফুপাইয়া কান্দিতে লাগিলে অন্য সখী কর্তৃক শয্যাপরি উপবেশন এবং সৌগন্ধিক বারি সিঞ্চন ও ব্যজনাদি দ্বারায় রাজকুমারীকে সুস্থতা করা হইলে, কথঞ্চিত সান্ত্বনা হইলেন। মুরলা বলিল, সখি! সুস্থতা হও, ধৈর্য্য অবলম্বন কর,

নিশাভাগে পরিস্থানে যাইয়া যুবক হেমচন্দ্রকে আনিয়া তোমার মনমালিন্য দূরীভূত করিব। সোহিনা বলিলেন, মুরলে! অসম্ভাবিত জনক প্রলপিত বাক্যে চঞ্চলিত চিত্ত কেমন করিয়া সুস্থতা হইবে আমাদের কারাগৃহে সশস্ত্রিক ভীষণাকার প্রহরী সকল নিযুক্ত রহিয়াছে, দ্বারবানদিগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সকল কালান্তক কালের প্রায়, দণ্ডে দণ্ডে, তদারক জন্য ভ্রমণ করিতেছে। সিংহনাদ সম ভয়ঙ্কর রবে নগরপাল সমূহের ডাকুনী হাঁকুনীতে গর্ভবতীর গর্ভস্রাবের উপলক্ষ প্রায়। চারিভিতের প্রতি দ্বারে, প্রতিফটকে, ছাদে, সিপাহী সান্ত্রীবর্গে নিযুক্ত রহিয়াছে। সেই কীট পতঙ্গাদির অগম্য স্থানে তুমি কেমন করিয়া গমন করিবে, কেমন করিয়া কৃতান্ত সম দ্বারবানের রক্ষিত দ্বারে প্রবেশ করিয়া হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। দুর্দ্দান্ত প্রহরী সমূহের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া তোমরা উভয়ে কেমন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবে। সখী মুরলে! তোমার ঐরূপ অকথ্য কথ্যানুযায়ীক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অন্তরিত হউক, শ্রবণমাত্রেই গাত্রলোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, হৃদপিণ্ড চঞ্চলিত হইতে থাকে, জীবাত্মা জড়িভূত হইয়া অসহ্য যাতনাদায়ক হইতে হয়, সখি! তুমি কেমন করিয়া ঐরূপ অসমসাহসিক কার্য্য সাধনায় ইচ্ছুকতা হইতেছ? মুরলা বলিল, রাজনন্দিনী! সামান্য কার্য্যের জন্য চিন্তিত হইতেছ কেন? তোমার অনুমতি হইলে সমুদ্রকে শুষ্কময় করিতে, পর্ব্বতকে চূর্ণিত করিতে, সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে কুণ্ঠিত হইব না। মুরলার! এবম্প্রকার আশ্চর্য্যজনক সাহসকতায় রাজকন্যা সোহিনী এবং সঙ্গিনী পরী রমণী সমূহে বিস্ময়ান্বিতে

রুদ্ধ প্রায় হইল, সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে মুরলা হেমচন্দ্রকে আনিবার জন্য বিদায় হইল।

রাত্র এক প্রহর অতীত প্রায়, পরীরাজ্যে কাশ্মীর সাহার রাজপুরী মণি-মাণিকের উজ্জ্বলিত জ্যোতিতে আলোকময় হইল। রাজবাটীর চতুরসীমাস্থ চারিটী ফটকে সুতানে, সুস্বরে নহবত বাদ্যে মনমোহিত করিতে লাগিল। কিঙ্কর, কিঙ্করী, প্রহরীবর্গে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ততাময়। কারাগৃহে প্রতিদ্বারে সশস্ত্রিক সশঙ্কিত-চিত্তে প্রহরীগণে নিযুক্ত ক্রমশঃ স্কন্ধে রাত্র অধিক হইলে প্রহরী-গণ ভিন্ন সকলেই নিস্তব্ধ। প্রহরীগণের উচ্চপদস্থ সশস্ত্রিক-বেশী এক ব্যক্তি কারাগৃহের প্রতিকক্ষস্থ দ্বারবানদিগকে সাব-ধানতা করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। একটি দ্বারে দ্বারবানের প্রতি জিজ্ঞাসিত হইল, মনুষ্য হেমচন্দ্র কোন কক্ষে রক্ষিত হই-য়াছে। কক্ষস্থ প্রহরী আগ্রহান্বিতে বলিল, মহাশয়! আমারই কক্ষে। আগত কর্ম্মচারীর অনুমতি ক্রমে, দ্বারস্থ প্রহরী কর্ত্তৃক দ্বারমোচন হইলে, উচ্চপদ ব্যক্তি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। যিনি রাজকর্ম্মচারী বেশে কারাগৃহে প্রবেশ করিল, তিনি রাজ-কুমারীর সহচরী মুরলা। মুরলা হেমচন্দ্রের নিকটবর্ত্তী আপন পরিচয় এবং সোহিনার অধৈর্য্যতা বিষয় জ্ঞাত করাইয়া, আপ-নার পরিচ্ছদ হেমচন্দ্রকে পরিধান করাইয়া বহির্দ্দেশে যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়া বিদায় দিলে হেমচন্দ্র কক্ষ হইতে, নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারবানের প্রতি দ্বার অবরুদ্ধ জন্য অনুমতি করিলে, অভিবাদনপূর্ব্বক প্রহরী দ্বারবদ্ধ করিল, এবং হেমচন্দ্র কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মুরলার সাঙ্কেতিক স্থানে সামান্য সময়মাত্র উপেক্ষাকৃত হইলে, মুরলা যুবরাজের

নিকটস্থ হইলে হেমচন্দ্র মূরলার প্রতি আশ্চর্য্যান্বিত জিজ্ঞাসিত হইলেন, সখি মূরলে! আমি কারাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলে আমার সম্মুখবর্ত্তীতেই দ্বারবান দ্বার অবরুদ্ধ করিল, পশ্চাৎ তুমি কিরূপে বহির্দ্দেশে গত হইলে? হাস্যমুখে মূরলা বলিল, যুবরাজ, আমার দ্বারায় না হয় এরূপ কোন কার্য্যই নাই। এখন আর কোন কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই, রাধিকা বাসর শয্যায় সজ্জিত হইয়া শ্যামচাঁদের জন্য উৎকণ্ঠিতা, নিকুঞ্জ কাননে গমন জন্য সময়াতিক্রম তোমার পক্ষে অবিধায়। পরী-নন্দিনী মূরলা হেমচন্দ্রকে পৃষ্ঠপরিধারণ করতঃ, শূন্যমার্গে দ্রুত-গামিনীতে অদৃশ্য হইল এবং ক্ষণসময় মধ্যেই তৃষিতা চাত-কিনী সোহিনার দক্ষিণ বিভাগে হেমচন্দ্ররূপ পয়োনিধি স্থাপনা করিয়া, হাস্যবদনে সোহিনার প্রতি মূরলা বলিল, রাজনন্দিনী অতীব কষ্টকর চন্দ্রার কুঞ্জ হইতে তোমার বনমালী আনিলাম, দূতীকে উপহার দেওয়া উচিত হয় না? মূরলা কর্ত্তৃক অঘটন ঘটিত কার্য্য সম্পাদনে, সোহিনা এবং সঙ্গিনীগণে আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়ান্বিতে প্রফুল্লময় চিত্তে মূরলার প্রতি হেমচন্দ্রকে কারাগার হইতে মুক্তি করিবার কৌশলতা জিজ্ঞাসিত হইলে, মূরলা কর্ত্তৃক চতুরতা পরিজ্ঞাত হইলে পরিশেষে কারাগৃহ হইতে মূরলার নিষ্ক্রান্ত বিষয় অবগত হইবার জন্য, হেমচন্দ্র কৌতূহলা-ক্রান্ত হইলেন। মূরলা বলিল, যুবরাজ! তাহাই যদি না হইবে তবে অতলস্পর্শিয় জলরাশীয় হইতে শ্বেত হস্তীরূপে, আমাদের হেমচন্দ্রকে কেমন করিয়া তীরবর্ত্তী করিয়াছিলাম। কারাগৃহ হইতে তোমায় অগ্রসর করিয়া, ইন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে মূরলা গবাক্ষ দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। সকলে প্রশংসাবাদ

করিলে, রাজকুমারী আপন কণ্ঠদেশ হইতে রত্নময় কণ্ঠহার উন্মোচন করয়া মুরলার কণ্ঠদেশে অর্পণ করিলেন। যুবক হেমচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া গদগদচিত্তে পরীনন্দিনীগণে, নৃত্য-গীতাদি মহোৎসবে উন্মত্তা হইল। যামিনী-শেষে মুরলা কর্ত্তৃক হেমচন্দ্রকে কাশ্মীরসাহার কারাগৃহে রহিতে হইল। প্রত্যহ যামিনীযোগে মুরলা-কর্ত্তৃক হেমচন্দ্রের যাওয়া-আসা হইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের কারাবাস জন্য, যুবক-যুবতী এবং সঙ্গিনীগণাদি কাহারই মনোকষ্ট রহিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অহিংসা পরমং ধর্ম্ম।

দিন যায়, সুখেই হউক দুঃখেই হউক, দিন যায়, দিন থাকে না। দিবা অবসান হইলেই নিশার আগমন, নিশা অবসানেই দিবাগমন। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এইরূপে পরম্পরায় সংসারচক্র ঘুর্ণিয়মান হইয়া প্রকৃতির গতি সম্পাদিত হইতেছে। রাজার রাজভোগেও দিন যায়, ভিখারিণীর ভিক্ষা করিয়াও দিন যায়। পুণ্যাত্মার পুণ্যসঞ্চয়ে দিন যায়, দস্যুর দস্যু বৃত্তিতে দিন যায়, দিন কাহারই বধ্য নয়। বীরধ্বজ সিংহ এবং শৈলেশ নন্দিনীর রাজ্যভোগে, জয়ধর সিংহ তারাবতীর বৈভবভোগে দিন যাইতেছে, চাঁপাবতীরও দুঃখার্ণবে পড়িয়া কান্না-কাটিতে দিন যাইতেছে। সকলেই দিনের বশীভূত, দিন কাহারই বশীভূত নয়। একদিন নবকুমার বাবু ইন্দ্রতুল্য অতুলনীয় বৈভবশালী ছিলেন, বিক্রমে সিংহ সদৃশ পীড়নায় শমন সদৃশ হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগে দিনাতিবাহিত করিয়া, সামান্য কাল মধ্যেই অতীব সুখের সংসারটী স্বপ্ন সদৃশ হইয়া

অস্তমিত হইল। কোথায় বা নবকুমার বাবু কোথায় বা গুণ-গ্রাহী পুত্ররত্ন হেমচন্দ্র, পাপরূপ অগ্নিরাশিতে সোণার লঙ্কা ভস্মীভূত হইল। আজ গৃহিণী চাঁপাবতীর সেই এক দিন আর এই একদিন। রাজরাণীর সুখ সৌজন্যতা, পরিসেবনাদি পরিবর্ত্তে কাঙ্গালিনী, পাগলিনী, দিনহীনার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন বেশে, হাহুতাশে, কেঁদেকেঁদেই সারা হচ্ছেন। চাঁপাবতীর এখন আর সে মূর্ত্তি নাই, সোণার কান্তি মলিনতা হইয়াছে। নির্ম্মল হাসিভরা মুখখানি এখন কালীমাময় হইয়া হাস্য পরিবর্ত্তে সততই ক্রন্দন স্রোতে বক্ষস্থল ভাসিতেছে। চাঁপাবতীর এখন সর্ব্বদাই মৌনবতী, কাহারই সহিত বাক্যালাপ করেন না, কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতাদি করিতেও বিরক্তা শারীরিক পরিমার্জ্জনীয় বিরক্তা, ভোজ্য দ্রব্যে বিরক্তা, সংসারাশ্রমের সকল সুখাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া চাঁপাবতী এখন ক্রন্দন সহ মৌনব্রতাবলম্বনেই দিনাতি বাহিত করিতেছেন। নবকুমার বাবুর বাটীতে বহু দিবসাবধি সহচরী নাম্নী একটী পরিচারিকা নিয়োজিত। হেমচন্দ্রের বিঘটিত, নবকুমার বাবু পলাইত, জমিদারী এবং বৈভবাদিতে সর্ব্বস্বান্ত, এই সকল বিপদগ্রস্থ হইলেও চাঁপাবতীর সেবা শুশ্রূষার নিরুপায় জানিয়া অধিকতর কষ্টভোগ করিয়াও সহচরী স্থানান্তরিত হইল না। পূর্ব্বকার অধিকতর শ্রদ্ধাভক্তিতে সহচরী কর্ত্তৃক চাঁপাবতীর সেবাশুশ্রূষা হইয়া আসিতেছে। সহচরীর অকৃত্রিমকর স্নেহ, মমতা যুক্ত যত্নেতে করিয়াই চাঁপাবতীর জীবন যাত্রা অতিবাহিত হইতেছে। জয়ধর সিংহের নিকট হইতে মাসিক দশটি টাকা লইয়াই সহচরী কর্ত্তৃক চাঁপাবতীর যথেষ্ট রূপে পরিচর্য্যা হইতেছে। চাঁপাবতী

শোকাবহ ক্লান্ত চিত্তি সান্ত্বনা জন্য সহচরী সর্ব্বদাই প্রবোধ সূচক নানারূপ উপদেশ দিয়া থাকে। যে নবকুমার বাবুর বাটীতে অধিকতর পরিবার বর্গে সুসজ্জিত হইত। আজ সেই বৃহৎ অট্টালিকায় দুইটি স্ত্রীলোক মাত্র অবস্থিতায় রাক্ষস পুরীর ন্যায় ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কেবল সহচরীর সাহার্য্যে, সাহসে, দাম্পত্যতাতেই চাঁপাবতী অবস্থিত আছেন। আজ নির্জ্জন বাটীতে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, সহচরীর সহিত চাঁপাবতীর কতকথাই হইতেছে। চাঁপাবতীর প্রতি সহচরী বলিল, মা! দিবানিশি কেঁদে কেঁদে সারা হলে যে, এরূপ বিপদাপদ এক সময় সকলেরই হইয়া থাকে। সকলের সকল দিন সমান যায় না, অজ্ঞানী লোকের মত উতলা হলে কি হবে, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক আমাদের আর কে আছে মা, তিনিই বিপদ হতে রক্ষা করবেন।

বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুবারি মোচন করিতে করিতে চাঁপাবতী বলিলেন, সহচরি! বিপদে মধুসূদন বই আর আমাদের কেহই নাই, তাহা সত্য, ত্রাণকর্ত্তা হরি ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই তাহাও জানি, মনে মনে সততই হরিপদ চিন্তাতেই দিনাতিপাত করিয়া থাকি, সহচরি! তথাচও মন আর প্রবোধ মানে না, কুবের সম অপরির্য্যাপ্ত ধনরাশী হইতে নিরাশ হইয়াছি, তাহার জন্য পরিতাপ করিনে। উজ্জ্বলিত সোণার সংসার নির্ব্বাণ দীপ সম তিমিরাকার হইয়াছে, তাহাতে দুঃখিত নই, দুঃখ সকলেরই হইয়া থাকে, সকল দিন সমান যায় না। কিন্তু আমার হেমচন্দ্রের শোকাগুণ আমার নির্ব্বাণ হইবার নয়। বাড়বানল সম চিরদিনের জন্য আমায় দগ্ধীভূত হইতে হইবে। আমার সোণার চাঁদ হেমচন্দ্রের সোণার মুখখানি

দেখিবার জন্য যদি আগুনে পুড়িতে হয়, বা সাগরে ডুবিতে হয়, তাহাতে সন্তোষিত চিত্তে প্রস্তুত আছি। আমার সোণার হেমচন্দ্রের সেই চাঁদ মুখখানিতে সুধাসম মা বলা কথাটি একবার মাত্র শুনিতে পাইয়া যদ্যপি এই অনিত্য কর দেহস্থ মস্তক খানি দেবী পদে উপহার করিতে হয়, তাহাতে এজন্মের জন্য আমি অসীমনীয় সুখমাপন্নতায় দেহ পরিবর্ত্তন করি। হৃদয়ালোকে আমার হেমচাঁদের নির্ম্মল শশীসম মুখখানি দেখিয়া হেমচাঁদকে এ সংসারের সংসারী হইতে দেখিয়া মরণকালে, স্বকায় স্বর্গলাভ জ্ঞান করিব। দুর্ভাগ্য দোষে সে আশা হইতে নিরাশা হইলাম। মৃত্যু হইলে যোগ্যণীয় পুত্র হেমচন্দ্রের হস্তে অগ্নি পাইয়া, পবিত্রতায় পবিত্রধামে গমন করিব, শ্রাদ্ধাধিকারী, পিণ্ডাধিকারী হেমচন্দ্রের মুখনিস্থত শ্রাদ্ধমন্ত্রে এবং পিণ্ডদানে পরিতৃপ্ত লাভে শান্তময় ধামে অবস্থিত হইব, বিধির চক্রে সকল কল্পনাই স্বপ্ন সদৃশ হইল, সহচার! মৃত্যুর কামনা বই এখনও কি এই ছার সংসারে তিষ্টতায় তুষ্টিজনক হইতে পারে। এখনও শারীরিক পোষকতা জন্য এদেহের যত্ন করিতে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে, এখনও সময় মতে আহারের প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সধবা রমণীর প্রধান কার্য্য পতিসেবা, পতিভক্তি পতিরসুশ্রুষা, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। পতিসন্নিহিতে রমণীয় স্বর্গ সুখবোধ হইয়া থাকে। স্বর্ণময় পুরীতে অবস্থিতা পতিব্রতা রমণীর পতিবিহনে শশ্মান-সম অসহ্যনীয় হইয়া থাকে, পতি সম্মীলনে শশ্মানও সুখমাপন্ন পূর্ণাশ্রম সম চিত্ত মধ্যে শান্ততা প্রাপ্ত হয়। এই কথা বলিয়াই পুনর্ব্বার চাঁপাবতীর চক্ষুদ্বয় হইতে টশটশ করিয়া অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল।

চাঁপাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে আপন স্বামী নবকুমার বাবুর উদ্দেশে বলিলেন, কোথায় যে গেলেন, কোথায় রহিলেন, তাহার কিছুই অনুসন্ধান হইল না। আহারের সময় কে তাঁহাকে সমাদরে, যত্নে আহারীয় প্রদান করিবে, ক্ষীর, ছানা, দুগ্ধাদির পরিবর্ত্তে অন্নাভাবে জঠর যাতনায় কাতর হইয়া হয়তো যথায় তথায় পরিভ্রমণ করিতেছেন। নিদ্রাকর্ষণে স্বর্ণপালঙ্ক স্থিত দুগ্ধ, ফেননিভ শয্যা পরিবর্ত্তে কোমলাঙ্গখানি হয় তো ধূলায় ধূসরিত হইতেছে। অনিত্যময়, ধন লোভে লোভিত হইয়া, সকলের সহিত বাদানুবাদেই এইরূপ আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মনুষ্যের বিপদ সময় উপস্থিত হইলেই মতিভ্রম হইয়া থাকে। আমাকে অনিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া, আমায় একক রাখিয়া পলাইত হইয়াছেন। চিত্ত চাঞ্চল্য জন্য বিপন্নতার কারণ আমাকে বিন্দুমাত্রও জানাইলেন না। আমি জানিতে পারিলে, তাঁহাকে পলাইত হইতে হইত না, এবং আমাকে কাঁদিতে হইত না। পরহিত-কারী অকপট হৃদয়, সদাচারী জয়ধর বাবুর নিকটে যাইয়া আমি বিনয়ে, স্তুতিভক্তিতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতাম, পরদুঃখে দুঃখী, পর সুখে সুখী, জয়ধর বাবু আমাদের সকল অপরাধে মার্জ্জনা করিতেন, সকল দিক বজায় রাখিতেন, তাহাতে আমার মর্য্যাদার ক্ষতি হইত না। তাহা না হইয়া তিনি সকল দিকে সর্ব্বনাশ করিয়া, আমায় কাঙ্গালিনী করিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন।

সহচরী চাঁপাবতীর প্রতি বলিল মা! গতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিয়া আর কি ফলোদয় হইবে, এখন রাধা-গোবিন্দ জীউকে ডাক, প্রভুর প্রতি মাননা কর, গোবিন্দ

জীউর কৃপায়, সকল কষ্টের শান্তি হইবে। স্বপ্নে আমার প্রতি প্রভুর প্রত্যাদেশ হইয়াছে, পাঠক! নবকুমারবাবুর বাটিতে গোবিন্দ জীউ নামে বিগ্রহ আছেন, চাঁপাবতীর সঞ্চিত অর্থব্যয়ে এপর্য্যন্তও গোবিন্দ জীউর সেবার ক্রুটি হইতেছে না। সহচরী গোবিন্দ জীউর প্রত্যাদেশ বিষয়, চাঁপাবতীর নিকট বর্ণিত করিবার উপক্রম করিলে, বহির্দেশ হইতে পত্র আছে, এই শব্দটী উভয়ের কর্ণগোচর হইলে, সহচরী বহির্ভাগে গমন করিল, ক্ষণমাত্রেই একখানি লিপিকা হস্তে প্রত্যাগতা হইল চাঁপাবতীর হস্তে অর্পণ করিল। লিপিকা উন্মোচন করিয়া চাঁপাবতী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

লিপিকার মর্ম্ম।

শুভানুধ্যায়ী শ্রীমতী চাঁপাবতী দেব্যা। সাধ্যাত্তমা দীর্ঘ আয়তেষু। পতিব্রতে, পতিপুত্র শোকে অসহনীয় শোকাতুরায় জীবিকাযাত্রা নির্ব্বাহিত করিতেছ, তাহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। সংসারাশ্রমীর পক্ষে সুখ, দুঃখ সংঘটিত যাহা কিছু প্রাক্তন লিখিত অখণ্ডনীয়, উহা খণ্ডন করিতে মানব মাত্রেরই সাধ্যাতীত, তজ্জন্যই বিজ্ঞানমাত্রে কষ্টভোগীতে মনকষ্ট না করিয়া সুখ দুঃখ সমভাব করেন। তুমি শাস্ত্রদর্শী বুদ্ধিমতী একটী অসামান্যে রমণী, তোমায় অন্য আর কি বুঝাইব, বিপদাপন্নে ঈশ্বরারাধনাভিন্ন সকলিই নিষ্প্রয়োজনীয় তাই বলি বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করিয়া, হরিপদ চিন্তায় পরমানন্দলাভে বিরত কেন। আর একটি কথা, পত্রপাঠ মাত্র যে কোন প্রকারেই হউক অতি শীঘ্র প্রয়াগধামে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ

করিবে। এবং বাক্যটি যেন অবহেলা করিও না, তাহা হইলে বিপদের উপর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রয়াগধামে আমারই আশ্রমে সাক্ষাৎ হইবে, ইতি।

পরমহংস বিল্বমঙ্গল স্বামী।

পত্রখানি পাঠান্তে চাঁপাবতী বিস্ময়ান্বিতে সহচরীর প্রতি বলিলেন, সহচরী! এ কিরূপ আশ্চর্য্যজনক সংবাদ, প্রয়াগধাম পরমহংস বিল্বমঙ্গল স্বামী, প্রয়াগধামাশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি করিয়াছেন। চাঁপাবতী স্বামীজীউর উদ্দেশে প্রণীতা হইয়া বলিলেন, যিনিই হউন, তাঁহাকে প্রণাম করি। পরিচিতও নন, এবং ঐ নামটিও কখনই শ্রবণ গত হয় নাই। একে দূরদেশ প্রয়াগধাম, তায় আমার অপরিচিত ব্যক্তির নিকট কোন সাহসেই যাইব, এবং ব্রাহ্মণের বাক্যই বা কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব, এও এবার একাটী উভয় সঙ্কট উপস্থিত। সহচরী বলিল উভয় সঙ্কট কি, আমাদের আবার সঙ্কটের বাকী আছে কি, বাকির মধ্যে না তোমার প্রাণ আর আমার প্রাণ, তার জন্য আর আশঙ্কা কি, যা হবার তাই হবে। মৃতদেহের জন্য আর যত্ন কেন। তীর্থবাসী ব্রাহ্মণের বাক্যে অবজ্ঞা করিয়া এই শশ্মানপুরীতে কি সুখে অবস্থিত হইব, মা! চল, আমরা দুইজনায় প্রয়াগধামে যাই। চাঁপাবতী বলিলেন, সহচরী! তুই যাহা মনমধ্যে অবধারিত করিয়াছিস তাহাই যুক্তি সঙ্গত, কিন্তু আমরা দুইটিতে বাটী হইতে যাইলে, প্রভু গোবিন্দ জীউর সেবার কিরূপ উপায় হইবে; এবং অজ্ঞানিত অগম্য পথে কোন দিকে কেমন করিয়া যাইব, তাহার জন্যই বা উপায় কি?

সহচরী বলিল, দেবভাণ্ডারে গোবিন্দ জীউর সেবার জন্য যাহা দ্রব্যের আয়োজন আছে, তাহাতে ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রভুর সেবা চলিবে, পুরোহিত ঠাকুরের উপর ভারার্পণ করিলেই ঐ কার্য্যটি সুসম্পন্ন হইবে। আর প্রয়াগ যাইতে জলপথই সুবিধা হইয়া থাকে, একখানি, নৌকা ভাড়া করিলেই নাবিক আমাদের প্রয়াগ ধামে পৌঁছাইয়া দিবে। সহচরীর মন্ত্রণাতেই চাঁপাবতীর মতস্থির করিলেন। পাথেয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া, সহচরী সমভিব্যবহারে চাঁপাবতী প্রয়াগতীর্থে সুযাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

———:*:———

আশ্চর্য্য জ্যোতিষ গণনা

——•——

বীরধ্বজসিংহ এবং শৈলেশ-নন্দিনী প্রেরিত অনুচরগণ হেমচন্দ্র এবং কমলকুমারীর অন্বেষণ জন্য দিগ্‌দিগান্তর পরিভ্রমণ করিয়া কেহই কোনরূপ অনুসন্ধান না পাইয়া ক্ষীরশায় প্রত্যাগত হইলে, বীরধ্বজসিংহ ও শৈলেশ নন্দিনী হতাশ, হেমচন্দ্র এবং কমলকুমারীর জন্য অন্তর্চ্ছেদ সম অসহ্য যাতনায় শোকাতুরা হইলেন। একদা নিশাভাগে বিলাসকক্ষে শৈলেশ-নন্দিনীর প্রতি বীরধ্বজসিংহ বলিলেন, শৈলেশ! জ্যোতিষ বিদ্যায় তুমি একটি অদ্বিতীয়া, তাহা হইলে বিঘটিত হেমচন্দ্র, বা কমলকুমারীর জন্য একটিবার গণনা করিয়া দেখ না কেন? শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, আপনি অতি উৎকৃষ্ট সুযুক্তি অবধারিত করিয়াছেন, আমি এতাবৎকাল ইহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। শৈলেশ-নন্দিনী একটি খড়িকা দ্বারায় অঙ্ক পাতিয়া আপন স্বামীর প্রতি বলিলেন, এই অঙ্কের চারি সীমার বর্ত্তীতে যে কয়েকটি ঘর অঙ্কিত হইয়াছে ইহার যে কোন ঘরে হউক একটি সুপারী

রাখিয়া দিন, এই গণনাটি হেমচন্দ্রের জন্য হইবে। রাজ্ঞীর কথিতানুযায়ী ক্ষীরশাপতি অঙ্কোপরি সুপারি রক্ষা করিলে শৈলেশ-নন্দিনী অঙ্ক গণিত করিয়া ঈষৎ ফুল্লচিত্তে বীরধ্বজ সিংহের প্রতি বলিলেন, মহারাজ! বৎস হেমচন্দ্র তো জীবিত আছে।

বীর। এখন কোথায় অবস্থিত?

শৈ। গণনা দ্বারায় বলিলেন, ভারতবর্ষের সীমাবর্ত্তীতেই।

বীর। কোন গ্রামে?

শৈ। ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী নির্জ্জনারণ্যে একটি প্রাসাদোপরি নিশাযাপন, দিবাভাগে কারাবাসে অবরুদ্ধ।

বীর। একি আশ্চর্য্য কাণ্ড, দিবসে কারারুদ্ধ, নিশাতে স্বাধীনত্ব এরূপ কোন রাজার দণ্ডে দণ্ডিত, এবং রাত্রিবিভাগে কাহার গৃহে অবস্থিত?

শৈলেশ নন্দিনী গণনায় কোনরূপ স্থিরকৃত করিতে না পারায় বলিলেন, ইহা জ্যোতিষার অসীমার্থ্বী। ক্ষীরশাপতি বলিলেন, তবে সকল জোতিষে তোমার অধিকার নাই? শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, হেমচন্দ্র মনুষ্যলোকে আছে, অথচ মনুষ্য গৃহে নাই। দেবযোনি ভুক্তে বা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষসাদির অভিভুক্তে থাকিলে মানব অধিকার ভুক্ত জ্যোতিষীতে থাকিবে না। যখন আমার গণিত জ্যোতিষাঙ্কে উহা দৃশ্য হইল না, তখন হেমচন্দ্র নিশ্চিত মনুষ্যাধিকারে নাই। বীরধ্বজসিংহ, বলিলেন, তবে কি হেমচন্দ্র কোন উপদেবতার চক্রে পতিত হইয়াছে। শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন তাহার জন্য আমি কোনরূপ নিশ্চিত করিতে অক্ষমাপন্না। ক্ষীরশাপতি রাজ মহিষীর প্রতি, কমলকুমারীর জন্য গণনায় অনুমোদন করিলে, শৈলেশ নন্দিনীর

গণনায় হেমচন্দ্রের ন্যায় অনিদৃষ্ট হইল। প্রাণাপেক্ষা স্নেহকর নিরুদ্দেশী জীবিত কমলকুমারীর মনুষ্যলোকেই অবস্থিত, এইটী জ্যোতিষীতত্ত্বে নিরূপিত হইলে, বীরধ্বজসিংহ এবং শৈলেশ নন্দিনীর বিমলিত চিত্ত আনন্দে প্রফুল্লিতময় হইয়া, পুনর্ব্বার অনিদৃষ্টের জন্য উভয়েরই শোক সিন্ধু উথলিত হইল। বীরধ্বজসিংহ রাজ্য সম্পদাদি অনিত্যকর ভাবিয়া অনিচ্ছুকতায় মহিষীর প্রতি জিজ্ঞাসিত হইলেন, মহিষী! দেখ দেখি, বিষধর সদৃশ আমাদের রাজ্যভুক্ত বিষয়ভোগ কত দিবসাবধি পরিলিপ্ততা আছে। শৈলেশ-নন্দিনী জ্যোতিষাঙ্ক নিদৃষ্ট করিয়া চমকিত হইলেন। শৈলেশ-নন্দিনীর হৃদ-পিণ্ড কম্পান্বিত, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, মুখকমল মলিনতা হইল। ক্ষীরশার রাজমহিষী বিমর্ষান্বিতে আপন স্বামীর প্রতি বলিলেন, মহারাজ! আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এক বৎসর মাত্র অন্তরে আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। মহারাজ! এই সর্ব্বনাশ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

ক্ষীরশার অধিপতি, মহিষীর প্রতি বলিলেন, রাজ্ঞি! তাহার জন্য কি তুমি ভীতা হইতেছ? কাহার রাজ্য, কাহার ঐশ্বর্য্য জন্য তোমার মমতার বৃদ্ধি হইতেছে। জীবাত্মা, অন্তর্হিত হইলে, পতি, পুত্র, কলত্রাদি চিত্তানন্দ প্রদক পরিবারবর্গের সহিত যখন নিমেষ মাত্রেই সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন সামান্য রাজ্য জন্য বিচলিত হওয়া বিজ্ঞানের পক্ষে অযুক্তিনীয়। জীব-মাত্রেই জীবদ্দশায় কার্য্যানুযায়ীক ফলভুক্ত হইয়া থাকে। প্রারব্ধ লিখিত সুখ দুঃখ হইতে পরিবর্ত্তিত জন্য জীব মাত্রেরই সাধ্যাতীত, তজ্জন্য অনুশোচনায় সময়াতিবাহিত করায় কেবল পাপের আশ্রয় হইয়া থাকে মাত্র। জীবাত্মার অবর্ত্তমানে দেহী-

দিগের সহিতও আত্মতা থাকে না। কেহবা অতুলনীয় বৈভবাদি রাজ্যভোগেও অসীম বিপন্নতা জন্য সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকেন, কেহবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে পুত্র পরিবার সহিত সুখসচ্ছন্দে দিনাতিবাহিত করিয়া থাকে। রাজার রাজ্যসুখেও দিন কাটিয়া যায়, ভিক্ষাজীবির ভিক্ষাবৃত্তিতেও দিন কাটিয়া যায়, তাপসীদিগেরও নিরাহারে তপস্যা ভোগে দিন কাটিয়া যায়। সুখ দুঃখ ঈশ্বরাধীন কার্য্য, এইজন্য বিজ্ঞান মাত্রে সুখ-দুঃখজনিত ষড়ঋতুকে সমতা জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগীজনে অনিত্যময় জীবনের জন্য বিন্দুমাত্রও মমতা রাখেন না, রাজ্ঞি! তুমি সামান্য রাজ্য হইতে পরিবর্জ্জিত জন্য চিন্তিত হইতেছ। এ রাজ্য কেবল পাপরূপ কণ্টকাকীর্ণ যাতনা দায়ক। ইহা হইতে অবসর লইয়া, রাজ্যেশ্বর সদানন্দময় রাজ্যে যাইবার জন্য যত্নের সহিত উপায় অবলম্বন কর। ক্ষীরশাধিপতি, মহিষীর প্রতি এইরূপ উপদেশ প্রয়োগ করিয়া পুনশ্চয় বলিলেন, রাজ্ঞি! এক বৎসরান্তে রাজ্য হইতে অবসর পাইব শুনিয়া যারপর নাই তুষ্টিলাভ করিলাম। কিন্তু দেখ দেখি এ রাজ্যটী কোন মহাত্মার অধিকারভুক্ত হইবে। স্বামীর অনুমোদনে পুনর্ব্বার জ্যোতিষাঙ্ক দর্শনে শৈলেশ-নন্দিনী সবিস্ময়ে, কৌতূকাবহে মলিনবদনে হর্ষান্বিতে ঈষৎ হাস্য করিলেন। অকস্মাৎ শৈলেশ-নন্দিনী মুদিত মুখ-কমল প্রফুল্লিত দেখিয়া বীরধ্বজ সিংহ বলিলেন, মেঘাবৃত বদন চাঁদখানি জ্যোতিষ দৃষ্টেই জ্যোতির্ম্ময় হইবার কারণ কি? শৈলেশ-নন্দিনী সহাস্যে বলিলেন, মহারাজ! পারিজাত পুষ্প অমরাবতীতে সুশোভিত হইয়া আনন্দকর সৌগন্ধিকে ইন্দ্র এবং শচীদেবীকেই পরিতোষিত করিয়া থাকে।

রত্নাকরোত্থিত সুধাভাণ্ড অমর ভিন্ন চণ্ডালের অধিকৃত হয় না; ক্ষীরশারাজ্যে আমার হারানিধি কমলকুমারী অধিশ্বরী হইবে। কমলকুমারী ক্ষীরশার অধিকৃতা হইবেন শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে বীরধ্বজ সিংহ বলিলেন, সধবাস্বিতায়, না বৈধব্যে? শৈলেশ-নন্দিনী বলিলেন, পতিব্রতা কমলের আমার বৈধব্য যাতনা হইবে কেন, সাধ্বীসতী অনন্তকাল পর্য্যন্ত পতিসুখে রাজ্যসুখে সুখিনী হইবে।

ক্ষীরশার অধীশ্বর আনন্দে গদগদ-চিত্তে মহিষীর প্রতি ধন্যতা-বাদ প্রদান করিলেন, এবং আপনাকেও ধন্যতা মানিলেন। বৎসরান্তে কমলকুমারী আসিবে, এবং হেমচন্দ্র আসিবে এই সুভজনক সংবাদ বীরেশ্বর হইতে জয়ধর সিংহ এবং তারাবতীকে ক্ষীরশায় আনিত পূর্ব্বক, মঙ্গলসূচক একটি মহা আনন্দোৎসবে ব্রাহ্মণ ভোজন, দান ধ্যানাদিতে অপরির্য্যাপ্ত অর্থব্যয়ে শান্তচিত্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

দীপনির্ব্বানোন্মুখ।

দিবাসুন্দরী প্রায় সপ্তম যামার্দ্ধে পদার্পণ করিয়াছেন, রাখালগণ গোষ্ঠলীলা সম্বরণ করিয়া, যষ্টিহস্তে ধেনুদলকে তাড়না করিতে করিতে, মধ্যে মধ্যে এক একটী গীত গাহিতে গাহিতে গৃহে গচ্ছং হইতেছে, আকাশমণ্ডল সুশোভিত করিয়া নানা-রঙ্গে বিহঙ্গগণ, দলে দলে শ্রেণীভুক্ত হইয়া, শাঁই শাঁই রবে নিজ নিজ আশ্রমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। এই সময় প্রয়াগ-তীর্থে পরমহংস বিল্বমঙ্গল স্বামীর আশ্রমে একটি প্রাচীন মনুষ্য রুগ্নশয্যায় শায়িত। মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বিল্বমঙ্গল স্বামী সমাসীন হইয়া রুগ্নব্যক্তির নাড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসিত হইলেন, এখন শারীরিক কিরূপ বুঝিতেছ? পীড়িত ব্যক্তি, ক্ষীণতাস্বরে বলিলেন, আর কি বুঝিব, এই সময় একবার কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, এই মাত্র মনের আকাঙ্ক্ষা রহিল, তাহা ভিন্ন মরিবার নিমিত্ত আশঙ্কিত নই। এই বলিয়া ক্ষণমাত্র

নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বিল্বমঙ্গল স্বামীর প্রতি বলিলেন, গুরুদেব! মহাতীর্থ প্রয়াগধামে, পূর্ণাশ্রমে, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে করিতে মৃত্যুলাভ হইলেই, ইহজন্মের জন্য পরিত্রাণ হই, এ জীবনে আর অন্য স্পৃহা নাই, কেবলমাত্র একবার হেমচন্দ্র—এই অর্দ্ধস্ফুট বাক্যটি নিঃসরণ করিয়াই রুগ্নব্যক্তি চক্ষু মুদিত করিলে, তুইটি চক্ষু বহিয়া অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। স্বামীজীউ পীড়িত ব্যক্তিকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া নবকুমার, নবকুমার বলিয়া বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই উত্তর পাইলেন না। পাঠক, এই রুগ্ন ব্যক্তিটি বীরেশ্বরপুরস্থ জমীদার নবকুমার বাবু। মোকদ্দমা সম্পর্কীয় গ্রেপ্তারী আশঙ্কায় পলাইত হইয়া এই প্রয়াগধামে কুলগুরু বিল্বমঙ্গল স্বামীর আশ্রমে গোপনেতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীজীউ বারম্বার নবকুমারবাবুর প্রতি সমাহ্বান করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এই সময় সহচরীর সহিত চাঁপাবতী সমুপস্থিতা হইয়া, আপন স্বামীকে মৃতপ্রায় শায়িতদৃষ্টে বিকলিতাত্মায় উচ্চনাদে বলিলেন, ওমা একি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। স্বামীজীউর পদতলে নিপতিত হইয়া সরোদনে বলিলেন, গুরুদেব! আমার মস্তকে বজ্রপাত না হইয়া একি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সহচরী, নবকুমারবাবুর পদতলে পতিত হইয়া, বাবা আমার এমন দশা কেন হলো গো; এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। বিল্বমঙ্গল স্বামী উভয়ের প্রতি বলিলেন, স্থির হও তোমরা একেবারে উতলা হইও না, এখনও জীবিত আছে। পরমহংসদেব পুনর্ব্বার নবকুমারবাবুর নাড়ী দেখিয়া বলিলেন, কৈ নাড়ীতো কোনরূপ ব্যতিক্রম জন্মায় নাই। ধাতু কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীণতা হইয়াছে

বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষাকৃত বেগ অতি সরল। স্বামীজীউর কথিতমতে চাঁপাবতী রোগীকে ঔষধ পান করাইয়া চক্ষুদ্বয়ে জলসিঞ্চন করিলেন। এইবার নবকুমারবাবু চক্ষুদ্বয় নিমিলিত করিলেন, এবং চাঁপাবতীকে দেখিয়া, চাঁপাবতীর প্রতি স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, হেন কিছু বলিবেন, অথচ বাক্য-নিসৃত হইতেছে না। চাঁপাবতী বলিলেন, কিছু বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে কি? কি বলিবেন, বলুন না, আমি আসিয়াছি। নবকুমার বাবু অতীব ক্ষীণতাস্বরে বলিলেন, তুমি আসিয়াছ, ভাল করিয়াছ, আমার হেমচন্দ্রকে আনিয়াছ কি? চাঁপাবতীর অন্তর্চ্ছেদ হইল, চক্ষু দুইটীতে টশ্ টশ্ করিয়া জল পড়িল, শোকাতুরা চাঁপাবতী কান্দিতে কান্দিতে নবকুমার বাবুর প্রতি বলিলেন, হেমচন্দ্র আমার ভাল আছে, আপনি আরোগ্যলাভ করুন, হেমচন্দ্রের জন্য ভাবিত হইবেন না। নবকুমারবাবু দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, এ পাপ জীবনের জন্য আর মমতা কেন, কাহার জন্য আরোগ্য হইতে বলিতেছ, কোন সুখের জন্য জীবনধারণ করিব, এবং লোকালয়েই বা কেমন করিয়া এ মুখ দেখাইব। প্রাণ যায়—জল। চাঁপাবতী নবকুমার বাবুর মুখে জলপ্রদান করিলে, নবকুমারবাবু জলপান করিয়া পুনর্ব্বার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষাকৃত যেন কিয়ৎপরিমাণে সুস্থতা লাভ করিলেন। পরমহংসদেব চাঁপাবতীর প্রতি বলিলেন, নবকুমারের সহিত অদ্যকার জন্য অধিক কথাবার্ত্তা কহিও না, রাত্র অধিক হইয়াছে, রোগীর একটু নিদ্রা হউক। এই বলিয়া মহাত্মা বিল্বমঙ্গল স্বামী আশ্রম হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া অন্যত্র গমন করিলেন। নব-

কুমারবাবু নিদ্রিত হইলেন। সহচরী এবং চাঁপাবতী জাগ্রতা হইয়া রহিলেন।

সহচরী চাঁপাবতীর প্রতি বলিল, মা! জগদীশ্বর আমাদের জন্যই কি যত বিপদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইন্দ্রতুল্য বিষয় বৈভব সকল বিনষ্ট হইয়া পথের ভিখারী হইতে হইয়াছে, সবে মাত্র একটী পুত্ররত্ন, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। তাহার পর আবার কিনা এই সর্ব্বনেশে বিপদ। গোবিন্দ জীউর কৃপায়, স্বামীজীউর আশীর্ব্বাদে এই বিপদ হইতে মুক্তি হই তবেই রক্ষা, তা নইলে আমাদের আর কি উপায় হবে মা? চাঁপাবতী বলিলেন, বাছারে! আমি এখন অকুল সমুদ্রে পতিত হইয়াছি, দুরাদৃষ্ট দোষে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার আশা নাই তবে গোবিন্দ জীউর ইচ্ছা, তিনি যদি বীরেশ্বরপুরে পুনশ্চয় যাইতে দেন তবে যাইব, নতুবা এই পর্য্যন্ত। সহচরী সহিত চাঁপাবতী বিপন্নতাজনক নানারূপ পরিশোচনীয় বাক্যালাপ করিতে করিতে, রজনী প্রভাত হইল। কোকিলের কুজনিত ঝঙ্কারে, বিহঙ্গের কলধ্বনিতে নবকুমার বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। পূর্ব্বশিখর-চূড়ায় সূর্য্যদেব লোহিত মূর্ত্তিতে জগজ্জনকে আনন্দিত করিলেন। প্রাতঃস্নানকৃত ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে উচ্চনাদে বেদধ্বনি করিতে করিতে গমন করিতেছেন। বিল্বমঙ্গল স্বামী আশ্রমে সমুপস্থিত হইয়া, নবকুমার বাবুর পীড়ার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আর চিন্তা নাই, রোগের অর্দ্ধাংশ আরোগ্য হইয়াছে, এই বলিয়া চাঁপাবতীর প্রতি পীড়িতকে ঔষধ সেবন করাইতে অনুমোদন করিয়া বিল্বমঙ্গল স্বামী আপন তপস্যা কার্য্যে গমন করিলেন। চাঁপাবতী নিয়মানুযায়িক

ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলে, কতিপয় দিবস মধ্যে নবকুমার বাবু আরোগ্যলাভ করিলেন। এক দিবস চাঁপাবতী নবকুমার বাবুর প্রতি জিজ্ঞাসিত হইলেন, আপনি প্রয়াগধামে গুরুদেবের আশ্রমে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন? নবকুমারবাবু বলিলেন, আমি অন্যান্য দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রয়াগধামে আসিয়া মনের তিতিক্ষায় এই কষ্টকর প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিত হইবার মানস করিয়া ছিলাম, তাহার পর গুরুদেব স্বামীজীউর সহিত সাক্ষাৎলাভ হইলে, প্রভু আমার প্রতি নানারূপ উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন, তদবধিই পরমহংসদেবের আশ্রমে অবস্থিত আছি।

তাহার পর নবকুমারবাবু চাঁপাবতীর প্রতি বীরেশ্বরপুরের বারতা জিজ্ঞাসিত হইলে, জয়ধর সিংহের এবং তারাবতীর সহিষ্ণুতা, মমতা, এবং অকপটচিত্তে স্নেহকরাদি আনুপূর্ব্বিক বারতা সকল চাঁপাবতী আপন স্বামীর নিকট বর্ণনা করিলেন। পুনর্ব্বার নবকুমারবাবু আপন গৃহিণীর প্রতি বলিলেন, সত্য সত্যই কি আমার হেমচন্দ্রের কোন সংবাদ পাইয়াছ? চাঁপাবতীর প্রফুল্লিত চন্দ্রাননখানি মলীনা হইয়া আসিল, সজলনেত্রে নবকুমার বাবু প্রতি বলিলেন, আমার হৃদয় রত্ন হৃদয়মণ্ডল হইতে অন্তর্হিত হইয়া, চিরদিনের জন্য এই চিত্ত মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমায় চির দুঃখিনী করিয়া গিয়াছে, এ আগুন কি আর নির্ব্বাণ হইবে। নবকুমারবাবুর মুখভঙ্গী বিকৃতাকার হইল, চক্ষুদ্বয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ হইল, একটী" দীর্ঘ নিশ্বাস নিপতিত করিয়া, হায়! হেমচন্দ্র আমার হৃদাকাশ অন্ধকার করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, এই বলিয়া নবকুমার-

বাবু ধরাশায়িত হইয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন। সহচরী ত্রস্তান্বিতে নবকুমারবাবুর চক্ষুদ্বয়ে বারি সিঞ্চন করিল। চাঁপাবতী নবকুমার বাবুকে উত্তোলন করিবার উপক্রম করিলে, অতীব ভারাক্রান্ত বোধ হইল। সর্ব্বাঙ্গ কঠিনতাদৃষ্টে নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, শ্বাস বায়ু রহিত, নবকুমারবাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। চাঁপাবতী এলোথেলো পাগলিনীর ন্যায় মৃতস্বামীর বক্ষে নিপতিত হইলেন। সহচরী পদতলে পড়িয়া উভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সাধ্বীসতী চাঁপাবতী বিধবা হইলেন, পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিলেন। একজনের জন্য সকল সুখ হইতে বিরহিত হইয়া চাঁপাবতী দুঃখ-সাগরে নিপতিত হইলেন। এই অসীম বিপন্নতা সময়ে শোকাতুরা রমণী দুইটীকে পরিসান্ত্বনা জন্য জনমনুষ্য মাত্র নিকটে নাই। অধৈর্য্যা চাঁপাবতী একেবারে চীৎকার ধ্বনিতে রোদন করিতেছেন, একবার সংজ্ঞাহীন প্রায় মৃতভর্ত্তার বক্ষোপরি নিপতিত হইতেছেন। এই সময় পরমহংস বিল্বমঙ্গল স্বামী সমুপস্থিত হইলে, চাঁপাবতী স্বামীজীর চরণে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব শাস্ত্রোক্ত নানারূপ উপদেশ সূচক-বাক্যে চাঁপাবতীকে কথঞ্চিত পরিসান্ত্বনা করিলেন। নবকুমারবাবুর স্বজাতীয় কয়েক ব্যক্তিকে আনিত পূর্ব্বক দাহকার্য্য নির্ব্বাহিত জন্য স্বামীজীউ অনুমোদন করিলে, ঐ সকল ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শবদেহ শ্মশানস্থ হইল। শোকাতুরা চাঁপাবতী, পতির সহিত সহমৃতা জন্য উৎকণ্ঠিতা হইলে, পুলিশ এবং স্বামীজীউ কর্ত্তৃক নিবারিত হইল।

নবকুমারবাবুর দাহকার্য্য সমাধা হইলে, কতিপয় দিবসান্তে

স্বামীজীউর সমভিব্যহারী সহচরী এবং চাঁপাবতী বীরেশ্বরপুরে প্রতিগমন করিলেন। চাঁপাবতী বীরেশ্বরপুরে সমুপস্থিতা হইলে, নবকুমারবাবুর মৃত্যুর বারতায় জয়ধরসিংহ যাহার পর নাই দুঃখিতমনা হইলেন। চাঁপাবতীর উৎকটিত বিপন্নতা শ্রবণে ক্ষীরশারাজধানী হইতে বীরধ্বজ সিংহ এবং শৈলেশ-নন্দিনী, এই উভয়ে বীরেশ্বরপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ক্ষীরশা-পতি, এবং জয়ধরবাবুর সাহায্যে প্রচুর অর্থব্যয়ে মৃত নবকুমার বাবুর শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপিত হইল। শ্রাদ্ধকার্য্যান্তে একদিবস বিল্বমঙ্গল স্বামী স্বহায়-হীনা চাঁপাবতীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য মহারাজ বীরধ্বজসিংহের এবং জয়ধরবাবুর সহিত সৎযুক্তি জিজ্ঞা-সিত হইলে জয়ধরবাবু এবং ক্ষীরশাপতি উভয়ে পরমহংসদেবের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়ান্বিত বলিলেন, প্রভু! সেইরূপ অনুমোদন করিবেন তাহাতেই আমাদের শিরোধার্য্য। বিল্ব-মঙ্গল স্বামী বলিলেন, শোক-সন্তাপিত চাঁপাবতী জয়ধরবাবুর অন্তঃপুরীতে অবস্থিতা হইলেই আমার মনতুষ্ট হয়। স্বামীজীউর অনুজ্ঞায় সন্তোষিতচিত্তে জয়ধরবাবু সম্মতি প্রদান করিলেন। পরিচারিকা সহচরীর সহিত চাঁপাবতী জয়ধরবাবুর বাটীতে কর্তৃসমা অতীব আদৃত সহিত অবস্থিতা হইলেন। পরমহংস-দেব সুপ্রসন্নচিত্তে সকলের প্রতি অনির্ব্বচনে প্রয়াগধামে শুভযাত্রা করিলেন, মহারাজ বীরধ্বজ সিংহ কতিপয় দিবসান্তে স্বস্ত্রীকে ক্ষীরশায় প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

মুক্তি বা প্রণয়ভঙ্গ।

—•—

বঙ্গভূমিস্থ প্রমোদ মন্দিরে পরীরাজ কন্যার প্রত্যাহিক নিশিযোগে রাসলীলা সমাধীত হইতেছে। প্রত্যহই সুরার গড়াগড়ি, সৌগন্ধিকের ছড়াছড়ি, সঙ্গীতের লহরীতে নর্ত্তকীদের অঙ্গভঙ্গী কৃত নৃত্যাদিতে, হেমচন্দ্রের মনমাতঙ্গ উন্মাদিত বা বিমোহিত হইয়াছে। সোণার গাছে, মুকুতার ফুলে, হীরকের ফলে, অতুলনীয় দীপ্ততাদর্শনে নবযৌবনা পরীরাজ কন্যার অনুপমা সৌজন্যতায়, পরিচর্য্যতায়, প্রেমালাপনায় মনুষ্যদেহী নরপ্রেমিক হেমচন্দ্র কি আর স্বাধীনতা রাখিতে পারেন, মোহিনীতেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া পরাধীন হইয়াছেন। কিন্তু ক্রম-সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের কাঞ্চন সম দীপ্তকর দেহখানি দিনে দিনে ক্ষীণত এবং মলীনতা হইতেছে। দিবাবিভাগে উৎকটিত কণ্টকর কারাবাস স্থিতে নিয়মিত আহারাদির অভাবে, এবং রাত্রকালে সুরাপান, রমণী বিলাস, রাত্র জাগরনাদি অত্যাচার মনুষ্য দেহে কত সহ্যতা হইবে। হেমচন্দ্রের মুখজ্যোতি মলীনতা, দেহের

দুর্ব্বলতা, চিত্তের বিমর্ষতা হইতে লাগিল। একদা প্রমোদাদিতে হেমচন্দ্রের স্পৃহা তিরোহিত হইল। একদা রাত্রিযোগে সোহিনার প্রমোদ মন্দিরে নৃত্যগীতাদি সমাপনান্তে শয়নকক্ষে হেমচন্দ্র সোহিনার প্রতি বলিলেন, রাজনন্দিনী! কারাবাসজনিত অসহ্য যাতনা আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে, যদি আমায় বাঁচাইবার জন্য তোমার ইচ্ছুকতা হয়, তবে সত্বরে ইহার জন্য একটি উপায় অবধারণা কর, দিনে দিনে আমার শরীর দুর্ব্বলতা এবং অবসান্বিতা হইতেছে। আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় তিরোহিত, শ্রবণেন্দ্রিয় বিরোহিত, এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়ই অবসন্নতাপন্ন প্রায়। সর্ব্বদাই মনের বিভ্রম জন্মাইয়া চিত্তবৃত্তির অধীরতা হইতেছে। নিশ্চিত পক্ষে কোনরূপ উৎকট পীড়া দায়ক হইয়া অবিলম্বেই আমার জীবন-লীলা পরিশেষ হইবে।

পরীরাজ কন্যা সোহিনা হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, প্রাণেশ্বর তাহার জন্য আর চিন্তিত হইতে হইবে না। এই বনস্থলির অবস্থিত নিয়মিত সময় সন্নিহিত হইয়া আসিয়াছে। কেবল মাত্র তিন চারি দিবস মধ্যেই সম্পূর্ণিতা হইবে। হেমচন্দ্র বলিলেন, তাহা হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হইবে। সোহিনা বলিলেন, আমি পরিস্থানে পিতৃ আবাসে প্রত্যাগমন করিব, আর তোমার কারাবাস হইতে পরিমুক্ত করিব। হেমচন্দ্র বলিলেন, কারাবাস হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় অবস্থিত হইব? সোহিনা বলিলেন, যথাস্থানে, বীরেশ্বর পুরস্থ তোমায় পিতৃধামে শুভাগমন করিবে। হেমচন্দ্রের নেত্রদয় বারি পূর্ণিত হইল, ছলছল চক্ষে হেমচন্দ্র বলিলেন, তাহা হইতে কারাগারে অসহনীয় যাতনায়

সহিত অবস্থিত হওয়াই স্বর্গসুখ সম সুখী হইব। সোহিনা বলিলেন, কেন হেমচন্দ্র! ঐরূপ সঙ্কল্পনার তাৎপর্য্যতা কি? হেমচন্দ্র সোহিনার প্রতি বলিলেন, তুমি মহা মান্যনীয়া রাজ-নন্দিনী আমি অতীব নিকৃষ্টকর মানবজাতি, সেই জন্যই এতদিনে অভাগ্যের প্রতি হতশ্রদ্ধায় পরিত্যাগ করিতেছ। তাহা হউক, তজ্জন্য আমি দুঃখিত নই, তুমি সুখে থাকিলেই আমি পরম সুখী হইব, আমি কারাবাসে থাকিয়া তোমায় রাজ সেবায় সেবিত দেখিয়া চরিতার্থ হইব। দিনান্তে তোমার রূপ সম্পূর্ণতা মুখচন্দ্রখানি একবার দেখিয়াই পরিতৃপ্ত হইব। তোমা অদর্শনে স্বর্গগামী হইলেও আমি সুখী হইতে পারিব না। রাজনন্দিনী? তোমার অধিক কথা বলা কেবল বাহুল্যতা মাত্র, এ অভাগ্যের পাপজীবন অন্তর্হিত না হইলে এদেহ ভস্মী-ভূত না হইলে তোমায় ভুলিতে পারিব না। কিন্তু, তুমি এইরূপ নিষ্ঠুর নির্ম্মম, নির্দ্দয়া হইবে বলিয়া আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। পরীজাত সকল শুদ্ধমতী, সরল প্রকৃতি, ধর্ম্মাশ্রয়ী বলিয়াই দৃঢ়রূপে অবধারণা ছিল, তদপরিবর্ত্তে ক্রূরজাতি সাপিনীর ন্যায় বিচ্ছেদ দংশনে চিরদিনের জন্য যে প্রজ্জ্বলিত করিবে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। এইরূপ আক্ষেপ উক্তিতে হেমচন্দ্রের অশ্রু-বারি বক্ষঃস্থলে বহিতে লাগিল। পরিরাজ কন্যা বস্ত্রাঞ্চলে হেমচন্দ্রের অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, হেমচন্দ্র! এইরূপে কান্দিয়া আমায় কাঁদাইও না, তুমি অধীরতা হইয়া আমার মর্ম্ম যাতনায় পীড়িত করিও না। হেমচন্দ্র! আমি তোমায় প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিয়াছি, অকপটচিত্তে তোমাতে এদেহ অর্পণ করিয়াছি, তোমায় ভালবাসিয়া স্বর্গসমা পরীধামে পরি-

ত্যক্ত হইয়া নরলোকে বিজনারণ্যে তৃতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়াছি। তোমার জন্ত একমাত্র অতীব আঁদরের কন্যা হইয়া পিতা মাতার চক্ষের বিষ হইয়া কতমত লাঞ্ছনা সহিয়াছি। এখন একটি বার ধৈর্য্য হও, হেমচন্দ্র! তোমায় আমায় বিচ্ছেদ জন্ত অধৈর্য্যতা হইও না, এই বিচ্ছেদটি যুক্তিসঙ্গত, অযুক্তি সঙ্গতে নয়, এ যুক্তিটি ধর্ম্মাচরণ সংঘটিত, পরীজাতি কখনই ধর্ম্ম বিদ্রোহিতা করে না। যাহাতে উভয় দিকে, ধর্ম্মরক্ষিত হইয়া থাকে সেই নিয়মটিই যথাযুক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

হেমচন্দ্র বলিলেন, রাজনন্দিনী! তুমি কাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাক তাহা বলিতে পারি না। এক ব্যক্তিকে স্বর্গসম সুখে সুখী করিয়া পরিশেষে অতলস্পর্শ সলিলে নিক্ষিপ্ত করিলেই কি ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়া থাকে? পরীরাজ কন্যা বলিলেন, হেমচন্দ্র! প্রণয়জালে জড়িত হইয়া মতিভ্রষ্ট হইও না। এ পর্য্যন্ত তুমি আমায় বিবাহ কর নাই, আমি তোমার বিবাহিতা পত্নী নই, অবিবাহিত রমণীর সহিত চিরদিনাবধি সহ-বাসে পুরুষের সংসার ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া পূর্ব্ব পুরুষগণের অভি-সম্পাদনে অন্তিমে অনন্তকাল জন্য নরকার্ণবে গতি হইয়া থাকে। হেমচন্দ্র! তোমার পিতা মাতা, বণিতা বর্ত্তমানে, তাহাদিগকে শোকাভিভুক্ত করিয়া সদাকাল তুমি আমার সংসর্গতা হইলে, আমাকেও মহাপাপে পরিলিপ্ততা হইতে হইবে; এবং তোমারও সকল দিকে কষ্টকর মাত্র। তুমি বিদ্বান, মহাজ্ঞানী মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত, তোমার প্রভাযুক্ত প্রজ্ঞানতা-অসিতে মোহ-জাল ছিন্ন করিয়া সুপথে পদার্পণ কর। আমি জ্যোতিষ ফলে নিকৃষ্ট করিয়াছি, হেমচন্দ্র বীরেশ্বরপুরের অধিপতি হইবে,

পতিব্রতা কমলকুমারী পত্নীরূপে গৃহ উজ্জ্বলিত করিবে, এবং অন্য একটী রাজ্যের অধিশ্বরী হইবে। প্রসিদ্ধতা রূপে প্রজাপালনায়, শান্তদান্ত, বদান্যতায়, যথাশাস্ত্রিক মতে দেব, দেবী, গুরুজনাদির প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি সহকারে, অর্চ্চনা বন্দনায় মহারাজ হেমচন্দ্র এবং মহারাণী কমলকুমারীর নামিত সুখ্যাতি ঘোষণায় পৃথিবী পরিপূর্ণিত হইবে। হেমচন্দ্র, এবং কমলকুমারীর অকৃত্রিম পুণ্য সঞ্চয়ে দেবগণ, এবং পূর্ব্ব পুরুষগণ মহানন্দময় হইবেন। পরীরাজ কন্যা পুনর্ব্বার বলিলেন, হেমচন্দ্র, চন্দ্রমেঘাচ্ছাদিত, অগ্নিভস্মাচ্ছাদিত ন্যায় তুমি অপ্রকাশিত, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ, তোমার ভ্রান্ততা দূরীভূত হইয়া চৈতন্য উদয় হইলে, তোমার জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত হইবে।

পরীরাজ কন্যা সোহিনার উপদেশক বাক্যে হেমচন্দ্র কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। সোহিনার প্রণয়াবদ্ধ হইতে যেন অধিকতর পরিমুক্ত হইলেন উপ-রমণীর সংসর্গ ভোগে অন্তঃকরণে ঘৃণার উদ্রেক হইল। বীরেশ্বরপুরে এবং জনক জননীর স্নেহ, মমতাদি স্নেহপটে আবির্ভূত হইয়া, হেমচন্দ্রের শোকসিন্ধু উথলিত হইল। হেমচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন কমলকুমারী প্রাণের কমলকুমারী, প্রাণের প্রাণ স্বর্ণলতা কুমলকুমারী কোথায় রহিল। কমলকুমারীকে কি আবার দেখিতে পাইব। আমার চিত্তপটাঙ্কিত পঙ্কজনয়না চন্দ্রাননা, মাধুর্য্যময়ী মধুভাষিণী কমলকুমারীকে আর কোথায় পাইব। হায় আমার কি পাষাণ হৃদয় আমার প্রাণের কমলকে হারা হইয়া এখনও জীবিত রহিয়াছি, কমল-বিহীন জীবনে এখনও সুখাভিলাষে নিস্পৃহা জন্মিল। প্রাণময়ী কমলকুমারীকে বিস্মৃত হইয়া চণ্ডালের ন্যায় পরকীয়ায়

উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছি। হেমচন্দ্র আবার ভাবিলেন, পরীরাজ কন্যার কথা কি বিশ্বাসনীয় হইতে পারে, এত দিনের পর আমার সোণার কমলকে পাইব। কমল আমার সহধর্ম্মিণী হইয়া হৃদপদ্ম প্রফুল্লিত করিবে, কমলকুমারী আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া গৃহ আলোকিত করিবে, স্নেহে অনুরাগে, সোহাগে আহ্লাদে মাখা-মাখি হইয়া আধ হাসিতে কথা কহিয়া কমল আমার হৃদ-কমল প্রফুল্লিত করিবে। এই দুরাদৃষ্টে এজনমে এমন দিন কি সংঘটিত হইবে, রাজকন্যা সোহিনা সত্যবাদিনী হইয়া এই তাপিত প্রাণ কি শীতল করিবে।

হেমচন্দ্র সোহিনার প্রতি বলিলেন, রাজনন্দিনী! আমি নিশ্চিত পক্ষে বলিতে পারি, মিথ্যা প্রলোভনে ভুলাইয়া পরি-শেষে তুমি আমায় অকূলপাথারে ভাসাইবে। কারণ এত দিনের পর অনিদৃষ্ট এবং অগম্য পথ হইয়া কিরূপে বীরেশ্বরপুরে প্রত্যাগত হইয়া জনকজননীর চরণদর্শনে কৃতার্থ হইব। জলমগ্না কমলকুমারীকেই বা কিরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইব। এই সকল অঘটন ঘটিত সূচক বাক্যে ভুলাইয়া কেবলমাত্র তুমি আমায় পরিত্যাগ করিবে, আর আমায় পথের কাঙ্গালী করিবে, এইটিই তোমার প্রধান উদ্দেশ্য মাত্র।

পরীরাজ কন্যা বলিলেন, আমি অবিশ্বাসিনী নই, অধর্ম্মিণী মিথ্যাবাদিনী নই। হেমচন্দ্র! আমার বাক্যে, কার্য্যে অবিশ্বাস করিও না। তুমি নিশ্চিত পক্ষে জানিবে, পরীরাজ কন্যা পর-হিতৈষিনী, পর দুঃখে দুঃখিনী, পরপীড়া দর্শনে মর্ম্ম পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে। এই মুখ নিঃসৃত বাক্য সকল মিথ্যাময় হইলে ধর্ম্মাদির তিরোহিত হইবে, বেদ সকল জ্যোতিষ সকল

মিথ্যাময় হইবে। হেমচন্দ্র ইহা নিশ্চিন্ত পক্ষে জানিও আমি কেবল তোমার প্রণয়-জালে আবদ্ধ হইয়া তোমার সহিত সুখাভিলাষে অভিলষিত হইয়া এতাবৎ কালাবধি মনুষ্যধামে বনবাসিনী হইয়া কষ্ট সহ্যতা করি নাই, কেবল তোমারই কষ্ট দূরীভূত করিবার জন্য এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তোমারই অসীমাকর বিপন্নতা নিবারণ জন্য পিতা মাতার নিকট কলঙ্কিতা হইয়াছি। হেমচন্দ্র আমার বাক্য দৃঢ় বিশ্বাস কর, চিত্তে আতঙ্কিত হইও না, সাহসে নির্ভর কর। সকলই পাইবে, সকলই হইবে, হইবে, তোমার কমলকুমারী পাইবে, রাজ্য পাইবে, তোমাদের রাজা রাণীর যশে পৃথিবী পরিপূর্ণিত হইবে। এ অধিনী পাপিনী নয়, মিথ্যাবাদিনী নয়, সধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মের সংস্পার্শমাত্রও করে না। যদি বল সহচরিণীগণ সহিত তুমি আমায় লইয়া অস্পর্শীয় ঘৃণিতময় সুরাপান করিয়াছ। হেমচন্দ্র! তাহা মনেও করিও না, আমরা দেবাংশোদ্ভূতা পরিজাতি, অস্পর্শীত, ঘৃণিত দ্রব্য সকল স্পর্শমাত্রও করিয়া থাকিনা। তোমারই শারীরিক পরিশোধনার্থে, পরিতোষনার্থে দেবলোকস্থ কল্পতরু হইতে সুধারস আনিত করিয়া সকলে সেবন করিয়াছি। তোমারই তুষ্টিসাধনার্থে গীত বাদ্য, নৃত্যাদিতে আনন্দোৎপাদিত করিয়াছি। হেমচন্দ্র! যদি বল পরীরাজ-কন্যা হইয়া বিনা বিবাহিতায় পরপুরুষ মানবে আসক্তা হইয়াছ কেন? তাহার কারণ, তুমি দেবলোক হইতে শাপভ্রষ্ট জন্য নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাত্মারূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমার সংসর্গ জন্য পুণ্য সঞ্চারিত ভিন্ন আমার এ অঙ্গে কোনরূপ পাপস্পর্শ হইবেনা। আমি তোমায় বিবাহ করিলে তোমার পিতৃবংশ বিলুপ্ত

হইয়া যাইত। তাহা হইলে তোমার পিতৃপুরুষগণের অভিসম্পাদনে আমাদের উভয়কে নরকগামী হইতে হইত। হেমচন্দ্র! আমি যদি তোমার জন্য বনবাসী না হইতাম, আমি যদি তোমার প্রেমালাপে আমার সমীপবর্ত্তী না করিতাম, তাহা হইলে এ জনমের জন্য তোমার বীরেশ্বরপুরে প্রত্যাগমন করা সংঘটিত হইত না। এ জনমের জন্য কমলকুমারীর সহিত সংমিলিত হইত না। আজীবন-কালের জন্য তুমি তোমার কমলকুমারীর বিচ্ছেদে নানাস্থানী হইয়া দেশে দেশে, বনে বনে কান্দিয়া পরিভ্রমণ করিতে। পতিব্রতা গুণশীলা কমলকুমারীও তোমার জন্য কাঙ্গালিনী হইয়া যথায় তথায় বেড়াইত।

পরীরাজ-কুমারীর বাক্যে হেমচন্দ্রের ভ্রমজাল বিছিন্ন হইয়া সংজ্ঞানের আবির্ভূত হইল। হেমচন্দ্র, আনন্দিতচিত্তে সোহিনার প্রতি বলিলেন, রাজকন্যা! তোমার অলৌকিক কৃপান্বিতাতেই আমি উদ্ধার হইয়াছি। এখন তোমার অভিমতে যেরূপ আদেশ করিবে, আমি তাহাই প্রতিপালনে বাধিত আছি। রাত্র নিঃশেষ প্রায়, এখন অতি শীঘ্র আমায় কারাবাসে পাঠাইবার উপায় করিয়া দাও। সোহিনার অনুমোদনে মূরলাকর্ত্তৃক হেমচন্দ্র পরীস্থানীর কারাবাসে প্রেরিত হইলেন।

যামিনী প্রভাত হইলে পরীস্থান হইতে দুইজনা অনুচর উপস্থিত হইয়া সোহিনার প্রতি বলিল, রাজকন্যা! আপনার মর্ত্তলোকে অবস্থিত ব্রত অদ্য পরিশেষ হইয়াছে, তজ্জন্য আপনাকে পরীরাজ্যে গমন জন্য পরীশ্বর অনুমোদন করিয়াছেন বনন্তপুরী রক্ষণার্থে দুইকন্যা অনুচরকে প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, পরীরাজ কন্যা আপন সঙ্গিনীগণ সহিত পিতৃরাজ্যে গমন করিলেন।

পরদিন প্রাতে মন্ত্রীবর্গ সমন্বিত কাশ্মীরসাহ বিচারাসনে উপবিষ্ট। হেমচন্দ্র এবং সোহিনা বিচারস্থলে সমুপস্থিত। পরীশ্বর রাজকন্যা সোহিনার প্রতি বলিলেন, কারাবাসী হেমচন্দ্রের প্রতি এক্ষণে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে তোমার অভিমত হয়? রাজকন্যা বলিলেন, উহাকে পরিমুক্তিদানে নিজদেশে প্রেরিত করাই আমার অভিমত হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী রাজকন্যার প্রতি বলিলেন, আপনি কাহার সহিত পরিণীতা হইতে স্থিরকৃতা হইয়াছেন? রাজকন্যা বলিলেন, তাহা পিতার মতানুযায়ীতে সম্পাদিত হইবে। রাজকুমারীর সৎপ্রকৃতি সূচক-বাক্যে কাশ্মীরসাহ সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন। কন্যার বাক্যানুরূপ মতে অনুমোদনপূর্ব্বক পরীরাজ সভাভঙ্গ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাক্ষস ধ্বংস।

উত্তর জলধির দক্ষিণ সীমান্ত প্রায় দুইক্রোশ অন্তরিত একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকার উন্নতভাগে একটি কক্ষপরি দুইটী রত্ন সিংহাসনোপরি রমণীস্বরূপ-সম্পন্না দুইটি রমণী উপবিষ্ট। বয়ঃক্রমে জ্যেষ্ঠাটি ষোড়শী নবযৌবনা, কনিষ্ঠা দ্বাদশবর্ষীয়া। জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার প্রতি বলিল, ভগিনী! কনিষ্ঠা হাসিভরামুখে জ্যেষ্ঠার প্রতি বলিল, কেন দিদিমণি! জ্যেষ্ঠা আপন করপল্লবে কনিষ্ঠার সুকোমল গ্রীবাখানি ধরিয়া বলিলেন ভগিনী! তোমার প্রকৃত নামটিই কি অলকামুঞ্জরী? পাঠক, এইবার জানিলেন, কনিষ্ঠা বালিকার নাম অলকামুঞ্জরী। অলকামুঞ্জরী কুসুমরাণী সম আপন দক্ষিণ করতলখানি জ্যেষ্ঠার বামস্কন্ধে স্থাপনা করিয়া বলিল, তা দিদি আমি জানিনে। নবীনা বলিলেন, তোমার পিতামাতাও

কি ঐ নামটি ধরিয়া ডাকিতেন। অলকামুঞ্জরী বলিল, পিতাকে জানিনা, মা আর মাসীমা ঐ বলেইত ডাকেন। নবীনা বলিলেন, ভগিনি! তোমাদের অন্য কোথাও ইতিপূর্ব্বে নিবাস ছিল কি? না এইটিই আদনিবাস, ইহা কি বলিতে পার? অলকামুঞ্জরী বলিল, আমি তাহা জানিনা, মা কিম্বা মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে। তরুণী বলিলেন, তুমি বড়টি হইয়াছ, মা তোমার বিবাহ দেন নাই কেন? অলকামুঞ্জরী ফুটন্ত গোলাপ ফুলের মত রাঙা ঠোঁট দুটিতে খিল্ খিল্ শব্দে হাসিয়া বলিল, বিবাহ কেমন দিদিমণি? যুবতী বলিলেন, বিবাহ কাহাকে বলিতে হয় জাননা, কি কখনও দ্যাখনা? অলকামুঞ্জরী বলিল, না দিদিমণি। কখনই দেখি নাই, তুমি দেখিয়াছ, আমায় একবার দেখাইবে। অনেক দিনের পর তরুণীর মুখবিন্দু হইতে কিছু কিঞ্চিৎ হাসির আভামাত্র প্রদর্শিত হইল, আবার চকিত মাত্রেই সৌদামিনীর ন্যায় মিশাইতে হইল। যুবতী অলকামুঞ্জরীর প্রতি বলিলেন ভগিনী! বিবাহ দেখিলে কি হইবে, বিবাহ করিতে হয়। অলকামুঞ্জরী বলিল, কেমন করিয়া বিবাহ করিতে হয় আমি তাত জানিনে দিদিমণি! যুবতী বলিলেন, তুমি জানিয়া কি করিবে, বিবাহ আপনা হইতে হইয়া থাকে না, পিতামাতার চেষ্টায়, উদ্যোগে পুত্র কন্যায় বিবাহ হইয়া থাকে। অলকামুঞ্জরী বলিল, বিবাহ কাহাকে বলা যায়, এবং বিবাহ হইলে কি কার্য্য হইয়া থাকে। নবীনা বলিলেন, পুরুষ আর রমণীতে শাস্ত্রানুযায়ীক মন্ত্রাদিতে বিবাহ হইয়া থাকে, বিবাহ কার্য্যে সমাধা হইলে, রমণী পুরুষের সহ সংযোগে রমণীর গর্ভোৎপাদন হইলে ঐ গর্ভ হইতে পুত্র বা কন্যা প্রসব হইয়া থাকে, সংসার এইরূপ সুনিয়মে বংশের

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অলকাসুন্দরী বলিল, দিদিমণি! পুরুষ আর রমণী কাহাকে বলা যায়? যুবতী বলিলেন, পুরুষ পুংলিঙ্গ আর রমণী স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গে সংযোযিত হইলে সন্তানোৎপন্ন হইয়া থাকে, তুমি আমি, আমরা রমণী, শশ্রুধারী পুংলিঙ্গদিগকে পুরুষ বলা যায়। পুরুষ রমণীতে বিবাহ হইলে রমণীকে পুরুষের অধিনী হইয়া থাকিতে হয়। পুরুষকে স্বামী সম্বোধনে দেবতাজ্ঞানে, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে স্বামীর পরিসেবনায় রমণী পতিব্রতা নামে পরিগণিতা হইয়া থাকে। পতিব্রতার পতিভক্তি-তেজে স্বামীর অমঙ্গল সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। পতিব্রতার জ্যোতিতে দেবাদিগণেও সশঙ্কিত হইয়া থাকেন। শাপাদিগ্রহ সকল বিদূরিত হইয়া যায়। পতিব্রতা রমণী স্বামীর আদৃতা এবং সকলের নিকটে প্রশংসিতা হইয়া থাকেন।

অলকাসুন্দরী নবীনার প্রতি বলিল, দিদিমণি! পুরুষ সকল কোথায় থাকেন, মা আমার বিবাহের জন্য পুরুষ কোথায় পাইবেন? যুবতী বলিলেন, লোকালয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ রমণী পুরুষের অবস্থিত। বালিকা বলিল, লোকালয় আবার কাহাকে বলা যায়? যুবতী বলিলেন, যে স্থানে নানাজাতীয় নর-নারী বসবাস করিয়া থাকে তাহাকেই লোকালয় বলিতে হয়। বালিকা বলিল, দিদিমণি! তবে তুমি, আমি মা আর মাসীমা, আমরা কেবল এই চারিটীতে এইখানে থাকি কেন? রূপরাশী নবীনার বিশালিত আঁখি যুগলে বারিধারা নিপতিত হইল; অবনতা বদনে কান্দিতে লাগিলে, বালিকা অলকাসুন্দরী আপন বস্ত্রাঞ্চলে বিমোচন করিয়া, যুবতীর প্রতি বলিল, দিদিমণি!

কি জন্য কাঁদিতেছ, আর কাঁদিও না, তোমার কান্না দেখিয়া আমার কান্না পাইতেছে।

নবীনা রমণী ক্রন্দন হইতে নিবৃত্তা হইলেন, আকাশ পথে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, দিনমণি অস্তমিত হইতে, চারিদণ্ড মাত্র বাকি রহিয়াছে। বালিকা অলকামুঞ্জরীর প্রতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ভগিনি! সাবধানতায় শ্রবণ কর, কাহারও নিকট প্রকাশিত করিও না, মনুষ্য বা রমণীর মধ্যে তুমি আর আমি আমরা দুইটী ভগিনী মাত্র। অলকামুঞ্জরী বলিল কেন, মা আর মাসীমা? যুবতী বলিলেন, উহারা আমাদের মা নয়, এবং মাসীও নয় উহারা রাক্ষসী জাতি। মনুষ্য জাতি উহাদের আহারীয়, মনুষ্যকে খাইয়া থাকে। জ্ঞান হয় নাই তোমাকে অতি শৈশবাবস্থায় কোথা হইতে আনিত করিয়াছে, তাহাতেই তুমি কিছুই বলিতে পার না; এবং শৈশবকাল হইতে লালন পালন করিয়াছে, সেই মমতা জন্য খাইতে পারে না। আমার প্রতি কিছুই যে করিবে তাহা তাহারাই বলিতে পারে। অলকামুঞ্জরীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল দিদিমণি! তোমাকে কোথা হইতে আনিত করিয়াছে? যুবতী বলিলেন কোথা হইতে তাহা জানি না, এক দেশে একটী উদ্যানে বসিয়া সন্ধ্যাকালীন আমি কান্দিতে ছিলাম, সেই স্থান হইতে উহারা দুইজনে অপহৃত করিয়া শূন্যপথে আমায় আনিত করিয়াছে। সেই দিনাবধি তোমার ন্যায় আমাকেও সমভাবে স্নেহে, যত্নে রাখিয়াছে, কিন্তু কোন সময় মনে কি উদয় হইবে, কিছু যে করিবে তাহা বলা যায় না ভগিনী। উহাদের সুমতি হউক, তোমাকে এইরূপ যত্নের সহিত

প্রতিপালন করুক, আমাকে খাইয়া ফেলিলেই আমি নিষ্কৃতি হই।

অলকাসুন্দরী বলিল, না দিদিমণি, তোমাকে রাখিয়া আমাকে খাউক, তোমায় না দেখিলে আমি বাঁচিব না। আর একটি কথা, উহারা সমস্ত দিবস কোথায় যায়, আর রাত্র হইলে আইসে? নবীনা বলিলেন, রাক্ষসী জাতির স্বভাবত নিয়মিত ঐরূপ, সমুদ্র-তীরে, পর্ব্বতে, নির্জ্জন বনে আহারের চেষ্টায় ভ্রমণ করিয়া থাকে। অলকাসুন্দরী বলিল, তবে দিবাবিভাগে আমরা দুই ভগিনীতে পলাইত হইব। নবীনা বলিলেন, আমরা বাটীর বাহির হইবার উপক্রম করিলেই তাহারা জানিতে পারিবে, আর অমনি আসিয়াই আমাদের মারিয়া খাইবে।

অলকাসুন্দরী ত্রাসে কম্পান্বিত কলেবরে বলিল, দিদিমণি! তবে আমাদের কি উপায় হইবে। যুবতী বলিলেন, অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে তাহাই হইবে, তাহা বই আমাদের উপায় নাই, ভগিনী তাহার জন্য আর ভাবিয়া কি করিবে। অলকাসুন্দরী বলিল, দিদিমণি! আর একটী কথা, আমি তোমায় বলিতে ভুলিয়াছিলাম, আজ রাত্রকালে তোমার আমার বিবাহ হইবে। কাল অধিক রাত্রে তুমি নিদ্রা গিয়াছ, আমি জাগিয়া ছিলাম তাই শুনিয়াছি। মা মাসীমাকে বল্লে, চণ্ডা মাসীমা মাকে বল্লে কিরে প্রচণ্ডা। মা বল্লে কাল আমাদের অলকা তিলকা মেয়ে দুটোর বে হবে। মাসীমা মাকে বল্লে বর কোথায় পাবি? মা বলে সাগরের ধারে সেই বট-গাছটায় যে ভোদো খোঁদো দুটি মামদো ভূত আছে না সেই তাদের সনে, মাসীমা শুনে বল্লে তা পাত্রদুটি মন্দ ছেলে নয়, ঘর জামায়ে হবে তো? মা বল্লে ঘর জামায়ে নয় তো কি পর

জামায়ে সে সব আমি ঠিক করে নিয়েছি। তবে যদি বল ছেলে দুটী মুসল মেনে, তাহোক, মুসল মানের ইমান আছে, মেয়ে দুটিকেও পুষবে, আর তোকে মোকেও তুষবে, কারুই কিছু কষ্ট থাকবে না। মাসীমা হাসি ভরামুখে বল্লে ছেলে দুটির বয়েস কত? মা বল্লে বয়েস বেশী কই আর তাতেই বট গাছের পাশে সেই ঝোড়বনটায় তোতে মোতে তিন পন বছর ছিলাম তারির কিছু আগে থেকে ওরা আছে মাসীমা বল্লে তাহলে আর বয়েস কই, না, হয় চার পোন বছর বইত নয়? তবে কাল রেতেই ঠিক বে হবে ত? মা বল্লে সে কথা আবার বল্‌তে। জলার পেত্নী, পেছুন মুখো; স্কন্ধকটা, মাথায় হাঁটা করে তাদের কুটুম্ব সাক্ষাৎকে নিমন্ত্রণ হয়ে গেছে। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়িছি, আর আর কি কথা, তা শুনি নাই।

অলকামুঞ্জরীর কথায় নবীনার মুখকমল মলীনা হইল। অধৈর্য্য হইয়া কান্দিয়া অলকামুঞ্জরীর প্রতি বলিল, ভগিনী! সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর আমাদের প্রাণে মারিয়া উদরস্থ না করিয়া সর্ব্বনাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অলকামুঞ্জরী বলিল, কেন দিদিমণি। আমাদের কি সর্ব্বনাশ করিবে? যুবতী বলি-লেন, ভূতের সনে বে দেবে, ধর্ম্মনষ্ট হইবে, আর মানুষী হইয়া পেত্নী হইতে হইবে। অলকামুঞ্জরীর প্রতি বলিলেন, ভগিনী। তুমি বাঁচিয়া থাক, জগদীশ্বর করুন তুমি রাজরাণী হও, আমি তোমার নিকুট হইতে বিদায় হইব একটি অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দাও, আমি তাহাতে দেহরক্ষা করিব। অলকামুঞ্জরী বলিল, না দিদি। আমাকে রাখিয়া তোমায় মরিতে দিব না, মরিতে হয় দুইটী ভগিনীতে একত্রেতে মরিব। যদি নিতান্ত পক্ষে আজিকার

রাত্রে রাক্ষসীরা ভূতের সহিত আমাদের বিবাহের উদ্যোগী হয়, তখন এই বাটীর সম্মুখবর্ত্তী সরোবর নীরে তুমি আমায় কোলে লইয়া নিমগ্না হইও। তোমার কোলে জলে ডুবিয়া মরিলেও আমি সুখী হইব। ভূতের সনে বিবাহ করবে পেত্নী আর রাক্ষসী, ধর্ম্ম সত্য থাকেন তবে আজিই ভূতের বাপের বে দেখাব, অলকামুঞ্জরী ত্রস্তান্বিতায় নবীনার প্রতি বলিল, দিদি-মণি। সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে, আমরা অন্য মনস্কায় রহিয়াছি। এই বলিয়া অলকামুঞ্জরী সকল কক্ষে আলোক জ্বালিত করিলে মণিমাণিক্যাদি জড়িত ঝালর সকল সৌজন্যতাময় দীপ্তিকা প্রকাশ হইল।

নবীনা রমণী অলকামুঞ্জরীর কর-পল্লব ধারণ করিয়া পদ-চারণে অসীম প্রভাময় মহামূল্য ঝালর সকল দেখাইয়া, অলকা-মুঞ্জরীর প্রতি বলিলেন, ভগিনী! ইহা সকল রাক্ষসীরা কোথায় হইতে আনিত করিয়াছে। অলকামুঞ্জরী বলিল, আমি তাহা জানি না, আমার জ্ঞান প্রাপ্ত অবধি কেবল দেখিয়াই থাকি। এই কথাটি বলিবা মাত্র, একটি পরমা সুন্দরী যুবতী রমণী এবং একটী রূপময় যুবক সম্মুখে উপস্থিত হইলে রমণীদ্বয় ভয়ান্বিত এবং বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পুনশ্চয় চকিৎমাত্রেই নবীনা রমণী চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দহীন আগন্তুক যুবকের প্রতি এক দৃষ্টা হইয়া রহিলেন। আগন্তুক নবীনা রমণীকে বাহুলতায় জড়িত করিয়া উচ্চনাদে বলিলেন, কমল, হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী কমল আমার প্রাণ প্রতিমা কমলকুমারি। তুমি এই স্থানে রহিয়াছ? পাঠক, নবীনা রমণীটি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা কমলকুমারী। কমলকুমারী সজল নেত্রে যুবকের প্রতি বলিলেন, হেমচন্দ্র,

প্রাণেশ্বর! আমি মরি নাই, তোমার জন্য এপর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছি। তুমি এখানে আসিলে কেন ইহা যে রাক্ষস পুরী, সর্ব্বনাশী রাক্ষসী দুইজন এখনিই আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে। তোমায় রক্ষা করিবার জন্য কিছুমাত্রই উপায় পাইব না, হেমচন্দ্র! আমার সর্ব্বনাশ করিতে কি জন্য এইস্থানে আসিয়াছ। আগতা রমণী কমলকুমারীর প্রতি হাস্য মুখে বলিল ভগিনী! রাক্ষসীর জন্য চিন্তিত হইও না, তোমার হেমচন্দ্র তোমায় লইতে আসিয়াছে, তুমি হেমচন্দ্রের সাধের কমল প্রফুল্লিত মনে আপন স্বামীকে যত্নে সোহাগে সমাদরে পরিতুষ্ট করিবে। তুমি তোমার হেম চন্দ্রের হৃদয়-সরোবরের প্রফুল্লিত কমল, রাক্ষসী ভবনে কেন, চল তোমার বীরেশ্বরপুর-ভবনে লইয়া যাই। কমলকুমারী চঞ্চলিতাচিত্তে আগতা রমণীর প্রতি বলিলেন, দিদিমণি! আমি কাঙ্গালিনী, কাঙ্গালিনী কমলের এমন দিন হবে বীরেশ্বরপুরে যাইব, পিতা মাতার চরণ দর্শন করিব আমার হৃদয়াধিত দেবতা হেমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইব? দাসী হইয়া স্বামীর পরিসেবনায় স্বর্গসুখ জ্ঞান করিব, দিদিমণি আপনি আমার পরম হিতৈষিকা এবং সৎস্বভাবান্বিতা, একটি রমণীর অগ্রগণ্যা যে তাহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, কৃপা করিয়া অধিনীকে পরিচয় দানে বাধিত করিবেন। অগত্যা বলিল, পরিশেষে আলাপন করিব অগ্রে তোমাদের বীরেশ্বর পুরে লইয়া যাই। কমলকুমারী চঞ্চলিতে, ত্রাসিতচিত্তে বলিলেন, এই রাত্রিকালে আমায় লইয়া যাইতে পারিবেন না। এখনিই সর্ব্বনাশী রাক্ষসীরা আসিবে আপনারা যে কোনরূপে হউক গোপনিত হইবার উপায় করুন। দুর্দ্দর্ষীরা এইবার

আসিল বলিয়া আর বিলম্ব নাই। অলকামুঞ্জরী উভয় আগন্তুকদের প্রতি বলিল, ওগো কেবল রাক্ষসীরা নয়, আজ আবার ভূতের দল আসিবে। হেমচন্দ্র, হাস্তমুখে অলকামুঞ্জরীকে দেখাইয়া কমলকুমারীর প্রতি জিজ্ঞাসিত হইলেন, এই কুমারীটি কাহার? কমলকুমারী অলকামুঞ্জরীর পবিচয় দিয়া, হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, এইবার সর্ব্বনাশ হইল, ঐ শোন প্রবল ঝটিকার ন্থায় ভয়ঙ্কর শব্দে রাক্ষসীরা আসিতেছে।

কমলকুমারীকে এই কথা বলিবা মাত্রেই দীর্ঘ এবং স্থূলাকার ভয়ঙ্করামূর্ত্তি রাক্ষসী দুইটা সকলের সম্মুখবর্ত্তী হইল। প্রচণ্ডা রাক্ষসী চণ্ডার প্রতি বলিল, হাত্থাথ চণ্ডা। সাত সুমুদ্যুর তের নদী বেড়িয়ে যানা হয়েছে তাই আজ ঘরে এসে মিললো। চণ্ডা অট্টহাস্তে বলিল, মেয়ে দুটোর বিয়ের আয় পয় ভাল, ছশো মহিষ, দশটা গাধা, তার সঙ্গে এই দুটো মানুষ হইলেই বেশ কুটুম ভোজন হবে এখন। প্রচণ্ডা বলিল, রেখেদে তোর কুটুম ভোজন এখন আমি পেটের জ্বালায় মরে যাচ্ছি, একটা তো খেয়ে বাঁচি। চণ্ডা বলিল, তবে তুই একটা খা, আর আমি একটা খাই, নইলে বেররাতে খাটতে পার্‌বিনে। এই বলিয়া উভয়ে ভয়ঙ্করমূর্ত্তিতে মুখব্যাদনপূর্ব্বক, প্রচণ্ডা হেমচন্দ্রের প্রতি, চণ্ডা আগন্তুকা রমণী মূরলার প্রতি গ্রাস করিবার উপক্রম করিলে, অলকামুঞ্জরী ভীষণাকার দর্শনে আতঙ্কিতে চীৎকার ধ্বনি করিলে, পরীকন্থা মূরলা অলকামুঞ্জরীকে ক্রোড়স্থ পূর্ব্বক একমুষ্টি ধূলিকা গ্রহণ, ও মন্ত্রপুত পূর্ব্বক হাস্ত বদনে উভয় রাক্ষসীর গাত্রোপরি নিক্ষেপণ করিলে উভয়েরই জীহ্বামূল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চণ্ডা ও প্রচণ্ডা ভয়ঙ্কর রবে হস্ত

প্রসারণ করিয়া, হেমচন্দ্র ও মুরলাকে ধৃত করিবার উপক্রম করিলে ছদ্রাণীবেশে অসি হস্তা হইয়া মুরলা রাক্ষসীদ্বয়ের হস্ত সকল ছেদিত করিল। এই সময় বাদ্যরবে যাত্রগণ সহিত মামদোভূত দুইটা বরবেশে নৃত্য করিতে করিতে উপস্থিত হইল। রাক্ষসী দুইটা কাটা হাত নাড়িয়া ভূতগণের প্রতি এস বাপ সকল বলিয়া আহ্বান করিলে মামদোভূত দুইটা নাকিস্বরে বিকট হাস্যে বলিল, আজ শুভদিনে তোমরা হাতকাটা জগন্নাথ হইয়াছ কেন। মুরলাকে দেখাইয়া চণ্ডা--প্রচণ্ডা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, এই মানুষী সর্ব্বনাশী আমাদের হাত কাটিয়াছে। ওটার মাথাটা ছিঁড়ে খাঁব বলিয়া মামদো দুইটা মুরলার দিকে অগ্রসর হইলে, মুরলা মন্ত্রপুত দ্বারায় ভূত সমূহকে বৃহৎ কুঁপার অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া, উহার মুখবন্ধ পূর্ব্বক সমুদ্রপরি নিক্ষেপিত পূর্ব্বক প্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে রাক্ষসী দ্বয়কে অসি প্রহরণে ছেদিত করিয়া উহাদের নিশেষিত করিল। কমলকুমারী রাক্ষসী নিধনে আনন্দিতা হইলেন, এবং মুরলার অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতা পন্নার সবিস্ময়ে মুরলার প্রতি পরিচয় প্রার্থনা করিলে মুরলা হাস্যবদনে আনুপূর্ব্বিক বিষয় বর্ণনা করিল। পরীরাজ কন্যা সোহিনা এবং সহচরী মুরলা কর্ত্তৃক হেমচন্দ্রকে পুনপ্রাপ্ত এবং রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইলাম জানিয়া কমলকুমারী বিনীতবাক্যে মুরলার প্রতি অভিবাদন করিলেন। অলকা-মুঞ্জরী এইবার নির্ভিক-চিত্তে কমলকুমারী প্রতি বলিল, দিদিমণি। তুমি ঠিক কথা বলিয়াছিলে, যে ঐ সর্ব্বনাশী দুইটা রাক্ষসী। মুরলা সস্নেহে হাস্যবদনে অলকামুঞ্জরীর মুখচুম্বন করিলে কমলকুমারী মুরলার প্রতি বলিলেন, দিদিমণি। এই

বালিকাটিকে আমি ভগিনী বলিয়াছি, ইহার কি উপায় হইবে।

হেমচন্দ্র এবং কমলকুমারীর প্রতি মুরলা বলিল, অলকা-মুঞ্জরী সামান্য কন্যা বলিয়া পরিগণিত করিও না ইটি রাজকন্যা, এই বৃহৎ অট্টালিকাখানি ইহারই পিতা, কর্ণাটপতি মহারাজ শান্তশীলের রাজভবন। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ বনভূমি সকল কর্ণাটেশ্বরে অধিনস্থ। ইহাতে প্রজা পুঞ্জ সমন্বিতা-বস্থায়, কর্ণাট নগরখানি অতীব সৌন্দর্য্যতাময় প্রদর্শিত হইল। মৃত দুষ্টা রাক্ষসীদ্বয়ে পরিবারবর্গ সহিত মহারাজ শান্তশীল এবং প্রজা সমুহকে বিনষ্ট করিয়া, রাজপুরিটি অধিকার করিয়া-ছিল। এ কন্যাটির বয়ঃক্রম তৎকালীন দুই বৎসর মাত্র; কেবল এই বালিকাটিকে বিনষ্ট না করিয়া প্রতিপালিত করিতেছিল।

মুরলার প্রতি হেমচন্দ্র বলিলেন, সখি মুরলা! মহারাজ শান্তশীলের বংশোদ্ধারের আর কি উপায় নাই। মুরলা বলিল প্রজাপুঞ্জ সহিত কর্ণাটপতিকে পুনর্জীবিত করিব, কিন্তু আমাদিগকে এই স্থানে অদ্য রাত্রি যাপন করিতে হইবে। মুরলার কথিতানুযায়িক সকলে রাজপুরীতে অবস্থিত এবং নিদ্রিত হইলেন। রজনী প্রভাতে হেমচন্দ্র এবং কমলকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেখিলেন পৌরজন সহিত মহারাজ শান্তশীলের প্রভাবতায় রাজবাটি উজ্জ্বলিত হইয়াছে। অপরিচিত জনের প্রতি কর্ণাটপতির দৃষ্টি নিক্ষেপণ হইলে, সবিস্ময়চিত্তে, কৃতাঞ্জলি-পুটে, বিনয়ান্বিত বাক্যে হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, আপনি দেবতা, এই দেবীগণ সহন্বিতে দেবলোক হইতে মর্ত্তলোকে শুভা-

গমন কেবল এই অধমের পরিত্রাণ জন্য, তাহাই নিশ্চিতপক্ষে জানিয়াছি। আপনাদের পদার্পণে আমার পুরী সহিত মানবদেহ পবিত্রময় হইল। আপনাদের কৃপাদানে আমরা পুনর্জীবিত হইলাম। এক্ষণে কিরূপে আপনাদের প্রতি পরিসেবনা করিব, তাহাই অধীনের প্রতি অনুমোদন করুন। এই বলিয়া কর্ণাট-পতি হেমচন্দ্রের প্রতি অবনত হইয়া প্রণীত হইবার উপক্রম করিলে, হেমচন্দ্র বলিলেন মহারাজ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। আমরা আপনার স্তুতি বাচ্যের সময়োগ্য নাই, এবং আমরা দেবদেবী নহি, আপনার সেবক সেবিকা দাস দাসীমাত্র। হেমচন্দ্র সহিত রমণীগণ কর্ণাটরাজ্যের প্রতি অভিবাদন করিলেন। হেমচন্দ্র, কর্ণাটপতির নিকট আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত করাই-লেন। পরী-নন্দিনী মুরলা, অলকামুঞ্জরীকে মহারাজ শান্তশীলের অঙ্কস্থ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনার কন্যারত্ন গ্রহণ করুন।

কমলকুমারী অলকামুঞ্জরীর প্রতি বলিলেন, ভগিনী! ইনি মহারাজ কর্ণাটপতি, এই মহাত্মনই তোমার পিতা হয়েন, তুমি রাজকুমারী হইয়া অজ্ঞানাবস্থা হইতে রাক্ষসীদ্বয়ের সন্নিকটে প্রতিপালিত হইতেছিলে। মহারাজ শান্তশীল হারাণধন কন্যা-রত্ন প্রাপ্ত হইয়া, গদগদচিত্তে অলকামুঞ্জরীর মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় অন্তঃপুর হইতে কর্ণাটরাজ মহিষী বিলাসবতী দ্রুতগমনায় সমাগত হইয়া কর্ণাটরাজ্যের ক্রোরস্থা অলকামুঞ্জরীকে আপন বক্ষোপরি স্থাপনায় বারম্বার মুখচুম্বনে বাৎসল্য স্নেহে বিগলিতা হইলেন। অলকামুঞ্জরী আপন গর্ভ ধারিণী জননীর প্রতি মধুময়রবে বলিল, মা! সর্ব্বনাশী

রাক্ষসীদের কুচক্রে পড়িয়া এতদিন পর্য্যন্ত পিতামাতায় বঞ্চিত হইয়াছিলাম। হেমচন্দ্রাদি আগন্তুকদিগকে দেখাইয়া বলিল, কেবল ইহাদেরই সানুকম্পায় মুক্তিকৃতা হইলাম। এবং জনক জননী সহিত কর্ণাটরাজধানীও পুনর্জীবিত হইল।

বিলাসবতী আপন কন্যার প্রতি বলিলেন, তুমি আমার গৃহ-লক্ষ্মী, কোনও দেবকুল হইতে তুমি কন্যারূপে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কর্ণাটরাজবংশ এবং অসংখ্য-প্রাণী সকলকে জীবন-দান নিস্তারণ করিলে। রাজপুরস্থ গৌরবর্ণের জীবন দানে এবং অলকাসুন্দরীর সন্দর্শনে রাজভবনে আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল রমণীদ্বয় সহিত হেমচন্দ্র নিজাবাসে গমন জন্য কর্ণাট-রাজ্যের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, মহারাজ শান্তশীল বিগলিত চিত্তে হেমচন্দ্রের প্রতি বলিলেন, বৎস হেমচন্দ্র! তোমারই অনুকম্পনে জীবন প্রাপ্ত হইয়া তোমার নির্ম্মলত্য চাঁদবদনখানি দর্শনমাত্রেই তোমাতে আমার অদিত্যকর জীবন অর্পণ করিয়া কর্ণাটরাজত্ব দক্ষিণত্য করিয়াছি। তুমিই আমার জীবনদান দিয়া পুনশ্চ জীবন লইয়া বিদায় হইতে চাহিতেছ। জগদীশ্বর পুত্ররত্ন হইতে আমায় বঞ্চিত করিয়াছেন, কেবলমাত্র এই অসামান্য কন্যাটি মাত্র, ইহাও তোমা হইতে পুনপ্রাপ্ত। বৎস! তোমারই এই সকল রাজ্য ঐশ্বর্য্য, তুমি আমায় পরি-ত্যাগ করিয়া বিদায় চাহিও না, তুমি নিশ্চিতপক্ষে জানিও কর্ণাটরাজের জীবন সত্তে তোমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। মহারাজ শান্তশীল এবং রাজমহিষীর অনুরোধতায় মুরলা এবং কমলকুমারী অন্তপুরবর্ত্তী হইলে, হেমচন্দ্র কর্ণাটরাজের প্রতি বলিলেন, মহারাজ! আমার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত আপনাতে

নিবেদিত করিয়াছি, বহু দিবসাবধি জনক-জননীতে বঞ্চিত হইয়া জীবাত্মা চঞ্চলিত হইয়া, জীবনে অতীব কষ্টকর হইতেছে। সন্তুষ্ট চিত্তে অধীনের প্রতি বিদায়দান করিলে কৃতার্থ হই। উভয়ে নানারূপ কথোপোকথনের পর কর্ণাটরাজের অনুরোধক্রমে সামান্য দিবস জন্য হেমচন্দ্র এবং রমণীদ্বয় কর্ণাটরাজপুরীতে অবস্থিত হইলেন।

একদা কর্ণাটরাজমহিষী মুরলার প্রতি জিজ্ঞাসিত হইলেন বৎস হেমচন্দ্রের কি দারকর্ম্ম সমাপিত হইয়াছে। মুরলা বলিল সমাধিত হয় নাই বটে, কমলকুমারীকে দেখাইয়া বলিল, এই কমল ফুলটির সহিত উভয়ের মনৈস্থর্য্য হইয়াছে। বিলাসবতীর মুখ কমল মুদিত বা মলীনতা হইল, এবং নয়ান দুটিতেও মুক্তাফলক সদৃশ বারিবিন্দু নিপতিত হইল। বিলাসবতীর মনঃক্ষুণ্ণতায় কমলকুমারী দুঃখিতচিত্ত হেতু জিজ্ঞাসিত হইলে, কর্ণাটমহিষী বলিলেন, বৎস হেমচন্দ্রের পদ সরোজে আমার অলকামুঞ্জরী কুসুমাকাঠি সমর্পিত করিতে আমার মনন হইয়াছিল, কিন্তু ও কমলে যখন আমার কমলকুমারী অধিকৃতা হইয়াছে, তখন আমার মন-কল্পনা কেবল ভ্রমমাত্র। কমলকুমারী হৃষ্টান্তকরণে রাজমহিষীর প্রতি বলিল, অলকামুঞ্জরীকে আমি ভগিনী বলিয়াছি, হেমচন্দ্র আমার ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিলে যগুপি আপনার মনতুষ্টিত হয়, ইহা হইতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে! কমলকুমারী হেমচান্দ্রর নিকট অলকামুঞ্জরীর বিবাহের কথা প্রশ্ন করিলে, হেমচন্দ্র বলিলেন, একাত্মা কয়দেহে পরিলিপ্ত করিব। কমলকুমারী বলিলেন, একটি পিঞ্জরে কি দুইটি পাখীর বাসস্থান হইতে পারে না। হেমচন্দ্র বলিলেন,—দুইটিতে সুমিলিত হইলে হইতে পারে। কমলকুমারী

মনে বুঝিলেন, অলকামুঞ্জরীর প্রতি হেমচন্দ্রের মনোনীত হইয়াছে। তাহা হইলেই আমার মনবাসনা পূর্ণিত হইল। সকল সময় আমরা দুইটি ভগিনীতে একত্রবাসে অসীম সুখসাপন্না হইব।

কর্ণাটরাজমহিষী বাসনাক্রমে, কর্ণাটরাজের অনুরোধে এবং কমলকুমারীর সরলতাময় ইচ্ছানুক্রমে আজ হেমচন্দ্রের বিবাহের জন্য রাজবাটীতে আয়োজন হইতেছে। রাত্রিকালে বিবাহ বাটীতে প্রজাপুঞ্জগণে সমুপস্থিত হইল। পুরোহিত এবং মুরলার মতানুক্রমে অগ্রবর্ত্তীতে কমলকুমারী কর্ত্তৃক গান্ধর্ব্বমতে হেমচন্দ্রের গলে বরমাল্য অর্পণ করা হইল। পশ্চাৎ যথাবিহিত মতে মন্ত্রপুত দ্বারায় অলকামুঞ্জরীর সহিত হেমচন্দ্রের পরিণয় কার্য্যসমাধিত হইল। কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, কর্ণাটরাজ কন্যা জামাতায় প্রতি, হস্তী, ঘোটক সকল এবং হীরা, মতি ইত্যাদি অপরির্য্যাপ্ত রত্ন যৌতুকদান করিলেন, এবং অসংখ্যক দাস দাসী সমন্বিতা হেমচন্দ্র, মুরলা, এবং রমণী সহিত বীরেশ্বরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্য হইতে মোহিনার লিখিত একখানি পত্রিকা হেমচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া মুরলা বিদায় লইয়া গমন করিল।